সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ৩১-৩২
- বার : সোমবার

- ০৮ মে- ২০২৩ ঈসায়ী
- ২৫ বৈশাখ- ১৪৩০ বাংলা
- ১৭ শাওয়াল- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল-কুরআনের জ্যোতি** ০৪
- ✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৫
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **তুহফায়ে যাইফুর রহমান**
    আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ১০
  - ❖ **কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সঠিক সময় ও নির্দেশনা**
    প্রকৌশলী মুহা. আরীফুল ইসলাম- ১৪
- ✍ **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **প্রফেসর ড. এম এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) ক্ষণজন্মা শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১৯
- ✍ **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - ❖ **রাসূল (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিল**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৩
- ✍ **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৫
- ✍ **বিস্ময়-বৈচিত্র্য :**
  - ❖ **জিহ্বা : হৃদয়ের দরজা**
    মো. হারুনুর রশিদ- ২৮
- ✍ **মহিলাজগৎ :**
  - ❖ **মুসলিম মহিলাদের জন্য উত্তম আদর্শ**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩৩
- ✍ **কবিতা** ৩৭
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৮
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ধারাবাহিক সাফল্যের বাতিঘর

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি' অনুমোদিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এ দেশের প্রাচীনতম অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী ইসলামি সংগঠন। এটি মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলমূলে নির্মল ও খাঁটি ইসলামের পথে আহ্বান জানায়। 'আক্বীদাহ্ ও 'আমল সংশোধনে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। সমাজ সংস্কার, আর্তমানবতার সেবা ও শিক্ষাখাতে এ সংগঠনটির অবদান অনস্বীকার্য। দেশের শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা হাজারো কওমী মাদ্‌রাসাকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড" গঠন করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শিক্ষাখাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড়ো ধরনের খিদমতের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে দক্ষ জনশক্তি উপহার দেওয়ার মানসে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এ সংগঠনের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ছিল। সে লক্ষ্যে সংগঠনটির প্রাক্তন সভাপতি, প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) ঢাকার অদূরে বর্তমানে আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইলস্থ কাইচাবাড়িতে ৫২ বিঘা জমি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর নামে ক্রয় করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণের পর ঢাকার লালমাটিয়ায় অস্থায়ী অফিস প্রতিষ্ঠা করে জমঈয়তের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর ২০০৩ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের তৎকালীন সদস্যগণ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এরপর ব্যানবেইজের সবেক মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন জমঈয়তের সভাপতি নির্বাচিত হলেন, তখন থেকে ঢাকার নাজির বাজারস্থ জমঈয়ত কার্যালয়ে বসে প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, সাবেক সচিব জনাব এম. এ. সবুর ও তরুণ প্রতিভা অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোজেক্ট প্রোফাইল ও প্রাথমিক নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করেন। অতঃপর মতিঝিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস স্থানান্তরিত হয়। অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী (রাহিমাহুল্লাহ) তখন শক্ত হাতে হাল ধরলেন এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবর্গের সার্বিক সহযোগিতায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রস্তুত করেন।

অধ্যাপক ইলিয়াস আলী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মৃত্যুর পর দেশের প্রখ্যাত শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী বিরল ব্যক্তিত্ব জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ট্রাস্টিবোর্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ফাইল প্রস্তুত করে সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে ফাইলটি জমা দেওয়া হয়। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাইপাইলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ও জায়গা পরিদর্শন করে 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি' অনুমোদন দেওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফাইলটি চূড়ান্ত অনুমোদন করেন। সেজন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় যাঁরা বিভিন্নভাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আলহাজ্জ এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, প্রফেসর একেএম শামসুল আলম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ এরশাদুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ), অধ্যাপক মোবারক আলী (রাহিমাহুল্লাহ), প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার উদ-দীন, অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব (রাহিমাহুল্লাহ), আলহাজ্জ মোহাম্মদ আমিনুল হক (রাহিমাহুল্লাহ), আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন, আলহাজ্জ ফকির বদরুজ্জামান, আলহাজ্জ ফকির আখতারুজ্জামান, আলহাজ্জ ফকির মনিরুজ্জামান, জনাব এম এ সবুর (মাস্কো গ্রুপ), আলহাজ্জ মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি), আলহাজ্জ আব্দুল আওয়াল আহমদ, আলহাজ্জ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইলিয়াস খান, শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, আলহাজ্জ মো. মোজাম্মেল হক, অ্যাডভোকেট মো. ফয়জুল বারী, ড. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম রিপন-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছে।

এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো এই অর্জনকে ধরে রাখা এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা। সেজন্য পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ, অভিজ্ঞ শিক্ষক সিলেক্‌শন, রাজনৈতিক কোলাহল মুক্ত পরিবেশবান্ধব একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করা। আমরা আশা করব, এটি শিক্ষা সেবায় নিরব বিপ্লব ঘটানো সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বৃটেনের অক্সফোর্ডের মতো আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত এবং জাতির জন্য একটি মাইলফলক হোক– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন –আমীন। ❑

আল-কুরআনের জ্যোতি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :

۞ ﴿وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾

☆ "আর স্মরণ করুন, যখন আমরা কাবাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজদাহ্কারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫)*

۞ ﴿اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾

☆ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা) ঘরের হজ্জ বা 'উমরাহ্ সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৮)*

۞ ﴿اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ﴾

☆ "হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে সে হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই করো আল্লাহ তা জানেন আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাক্বওয়া অবলম্বন করো।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৭)*

۞ ﴿فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

☆ "তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন- মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭)*

۞ ﴿وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۙ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ﴾

☆ "আর মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দিন, তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে; যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।" *(সূরা আল হাজ্জ : ২৭-২৮)*

হাদীসে রাসূল ﷺ

কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : একবার ‘উমরাহ্ করার পর আরেকবার ‘উমরাহ্ পালনে দুই ‘উমরার মধ্যবর্তী সকল পাপ মোচন হয়। আর পুণ্যময় হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।”[১]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ‘আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনা।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে রসিকতা করে– ‘হে বিড়ালের পিতা’! (ইয়া আবা হুরাইরাহ্!) বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহর্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি, মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا».

“এক ‘উমরাহ্ পালনের পর আরেক ‘উমরাহ্ পালনের মধ্যবর্তী সকল পাপ মোচন হয়ে যায়।”

‘উমরাহ্ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ‘ইবাদত; যার অর্থ কোনো স্থানের যিয়ারত করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময় মসজিদুল হারামে গমন করে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে ‘উমরাহ্ বলা হয়। ‘উমরাহ্; এক ‘উমরাহ্ থেকে পরবর্তী ‘উমরার মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু পাপ (সগীরা) কাজ ঘটবে তার জন্য কাফফারা। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয় রামাযান মাসের ‘উমরাহ্ একটি হজ্জের সমান।[২]

«وَالْحَجُّ المَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

“আর পুণ্যময় হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।”

শাব্দিকভাবে "الحَجُّ المَبْرُوْرُ" অর্থ হলো– পুণ্যময় হজ্জ। হজ্জে মাবরূর হলো, যে হজ্জ কেবল মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভের জন্যই সম্পাদন করা হয়, আর তাতে মানুষকে দেখানো বা শুনানোর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।[৩]

সহীহুল বুখারী’র সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যগ্রন্থ ফতহুল বারীতে হজ্জে মাবরূরের পরিচিতি প্রসঙ্গে যা উল্লেখিত হয়েছে তার সারাংশ হলো, “হজ্জে মাবরূর হলো আল্লাহ তা‘আলার কাছে গৃহিত হজ্জ। যে হজ্জে কোনোরূপ পাপের মিশ্রণ ঘটেনি। যে হজ্জে সমুদয় নিয়ম বিধান পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়েছে।”

হজ্জে মাবরূরের পরিচয় বর্ণনায় আল্লামা সালিহ আল উসাইমিন আরো বলেন, যে হজ্জে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জের

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৭৩।*

[২] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫০৯।*

[৩] *শরহু রিয়াযিস স্বলিহীন- মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন, পৃ. ৯৩৩।*

নিয়ম বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয় এবং যে হজ্জ হালাল সম্পদ ব্যয়ে সম্পন্ন হয়।[৪]

হজ্জে মাবরূরের পরিচয় বর্ণনায় নবী (ﷺ) হতে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ :

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ.

"পুণ্যময় হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত। বলা হলো– হে মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! হজ্জে পুণ্য কী? নবী (ﷺ) বলেন, খাদ্য খাওয়ানো এবং সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো।"[৫]

হাজীদের হজ্জ ও 'উমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। এরূপ লক্ষ্য স্থির করে নেয়া হাজীদের জন্য ওয়াজিব। অতএব নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও 'আমল দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে, যাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। আর দুনিয়া ও তার মিথ্যা মায়াজালের চাকচিক্য থেকে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। লোক দেখানো বা হাজী নাম ভাঁঙ্গিয়ে জনগণকে হজ্জের গল্প শুনিয়ে গর্ব প্রকাশ করা থেকে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়ে চলতে হবে। কারণ এ সমস্ত উদ্দেশ্য বড়ই জঘন্য, তা তার 'আমল বাতিল হওয়ার এবং মহান আল্লাহর নিকট তার 'আমল গ্রাহ্য না হওয়ার কারণরূপে বিবেচিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"যারা পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমকের আকাঙ্ক্ষা করবে, তাদের 'আমলের প্রতিদান আমি এ জগতেই দিয়ে থাকি এবং তাদের এ জগতে প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কম করা হয় না। কিন্তু তারা ঐ শ্রেণিভুক্ত যাদের পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্য নেই। এ জগতে তারা যা কিছু করেছে সমস্তই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল। আর তারা যা কিছু 'আমল করেছে সবই বাতিল হয়ে গেল।"[৬]

ইসলামী শরিয়তে হজ্জ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত, সিয়াম ও যাকাতের মতো হজ্জ পালন করা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর ফর্‌য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে হজ্জ করা মানুষের উপর ফর্‌য যারা যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। আর যে তা অমান্য করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।"[৭] তিনি আরো বলেন,

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পূর্ণ করো; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী করো। আর কুরবানীর জন্তুগুলো তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয় বা তার মাথায় অসুখ থাকে তবে সে রোযা কিংবা সাদাক্বাহ্ অথবা কুরবানী দ্বারা সেটার ফিদইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থায় থাকো তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে 'উমরাহ্ করতে চায়, তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী করবে; কিন্তু কেউ যদি তা না পায় তবে হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে আসো তখন সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন রোযা রাখবে; এটা তারই জন্য যে মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"[৮]

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে অন্যতম হলো হজ্জ, হাদীসে এসেছে–

---

[৪] *শরহু রিয়াযিস স্বলিহীন- মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন- পৃ. ৯৩৩।*
[৫] *ফাতহুল বারী- ৩/৭২৬।*
[৬] *সূরা আল হূদ : ১৫-১৬।*
[৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭।*
[৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা- ১. আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, একথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. নামায প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা। ৫. রামাযানের রোযা পালন করা।[৯]

হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ সম্পাদন করো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তা কি প্রতি বছর? তিনি নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোনো কিছু করার নির্দেশ দিই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং যখন তোমাদের কোনো কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করো'।[১০]

[৯] *বুখারী- হা. ৮; মুসলিম- ১/৫, হা. ১৬; আহমাদ- ৬০২২, ৬৩০৯।*
[১০] *মুসলিম- হা. ১৩৩৭; মিশকাত- হা. ২৫০৫; ইরওয়া- হা. ৯৮০।*

মহান আল্লাহর নিকট মাকবুল হজ্জের মর্যাদা

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ : "إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ". قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : "جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ". قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : "حَجٌّ مَبْرُوْرٌ".

আবূ হুরাইরাহ্ (আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম?" তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। আবার প্রশ্ন করা হলো– এরপর কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন : মহান আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– এরপর কোন্ কাজ উত্তম? তিনি বললেন : হজ্জে মাবরূর অর্থাৎ- মকবুল হজ্জ।[১১]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ : "لَا، لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ".

'আয়িশাহ্ (আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূল (ﷺ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা (মেয়েরা) যুদ্ধকে সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি। আমরা কি যুদ্ধে শামিল হবো না? তিনি বললেন : না; বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যুদ্ধ হলো হজ্জে মাবরূর (মকবুল হজ্জ)।[১২]

হজ্জ পালনকারী গুনাহ হতে মুক্ত হয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

আবূ হুরাইরাহ্ (আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ শেষ করল এবং হজ্জ সমাপ্তিকালে কোনো ধরনের অশ্লীল কথা, কিংবা পাপ কাজে রত হলো না, সে যেন সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরল।[১৩]

হজ্জ দরিদ্রতা ও গুনাহসমূহ বিদূরিত করে

হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

[১১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১৯।*
[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২০।*
[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২১।*

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা হজ্জ ও 'উমরার মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখো (অর্থাৎ- সাথে সাথে করো)। কেননা এ দু'টি মু'মিনের দরিদ্রতা ও গুনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন- (কামারের আগুনের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে দেয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[১৪]

হজ্জ পূর্ববর্তী গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়

হাদীসে এসেছে– ইবনু শামাসা আল-মাহরী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি বায়আত করতে পারি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কি ব্যাপার হে 'আম্র? আমি বললাম, আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা যেন আমার (পিছনের সব) গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন, হে 'আম্র! তুমি কি জানো না, 'ইসলাম' তার পূর্বেকার সকল পাপ বিদূরিত করে দেয় এবং 'হিজরত' তার পূর্বেকার সকল কিছুকে বিনাশ করে দেয়। একইভাবে 'হজ্জ' তার পূর্বের সবকিছুকে বিনষ্ট করে দেয়'?[১৫]

হজ্জের নিয়তকারীগণ কোনো কারণে হজ্জ করতে সক্ষম না হলেও নেকী পাবে

হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ, 'উমরাহ্ কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখে দিবেন' (এ বিধান কিয়ামত পর্যন্ত)।[১৬]

হাজীগণ মহান আল্লাহর মেহমান

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ : الْغَازِيْ، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহর মেহমান হলো তিনটি দল– আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জকারী ও 'উমরাহ্কারী'।[১৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ.

'হজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনকারীগণ মহান আল্লাহর মেহমান। তারা দু'আ করলে তিনি কবুল করেন। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন'।[১৮]

হাজীদের প্রতিটি পদচারণায় নেকী অর্জিত হয় ও গুনাহ বিদূরিত হয়

হাদীসে এসেছে– ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, এই সময় প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিখেন এবং একটি গুনাহ বিদূরিত করেন এবং একগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।[১৯]

হজ্জের তাৎপর্য

১) ইহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হজের সফরে রওয়ানা হওয়া কাফন পরে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে আখেরাতের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২) হজ্জের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া আখিরাতের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজনয়ীতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩) ইহরাম পরিধান করে পূত-পবিত্র হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য 'লাব্বাইক' বলা সমস্ত গুনাহ-পাপ থেকে পবিত্র হয়ে পরকালে মহান আল্লাহর কাছে হাজিরা দেয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আরো

[১৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৮১০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৬৩০; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১০৫।*
[১৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১২১; ইবনু হিব্বান- হা. ২৫১৫।*
[১৬] *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান- হা. ৪১০০; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১১৪; সহীহাহ্- হা. ২৫৫৩।*
[১৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা.২৬২৫; সহীহুল জামে'- হা. ৭১১২; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১০৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫৩৭।*
[১৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৯২; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১০৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫৩৬।*
[১৯] *ইবনু হিব্বান- হা. ৩৬৯৭; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১৪৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫২৮।*

স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইহরামের কাপড়ের মতো স্বচ্ছ-সাদা হৃদয় নিয়েই মহান আল্লাহর দরবারে যেতে হবে।

৪) 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে বান্দা হজ্জ বিষয়ে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে মহান আল্লাহর যে কোনো ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকার কথা ঘোষণা দেয় এবং বাধাবিঘ্ন, বিপদ-আপদ কষ্ট-যাতনা পেরিয়ে যে কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা ব্যক্ত করে।

৫) ইহরাম অবস্থায় সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মু'মিনের জীবন বল্গাহীন নয়। মু'মিনের জীবন মহান আল্লাহর রশিতে বাঁধা। আল্লাহ তা'আলা যেদিকে টান দেন সে সেদিকে যেতে প্রস্তুত। এমনকী যদি তিনি স্বাভাবিক পোশাক-আশাক থেকে বারণ করেন, প্রসাধনী আতর স্নো ব্যবহার, স্বামী-স্ত্রীর সাথে বিনোদন নিষেধ করে দেন, তবে সে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়ে যায় এসব থেকে। মহান আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বৈধ এমনকি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসকেও ছেড়ে দিতে সে ইতস্তত বোধ করে না বিন্দুমাত্র।

৬) ইহরাম অবস্থায় ঝগড়া করা নিষেধ। এর অর্থ মু'মিন ঝগড়াটে মেজাজের হয় না। মু'মিন ক্ষমা ও ধৈর্যের উদাহরণ স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। মু'মিন শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া-বিবাদের ঊর্ধ্বে উঠে সে পবিত্র ও সহনশীল জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

৭) বায়তুল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মু'মিন নিরাপত্তা অনুভব করে। কেননা বায়তুল্লাহকে নিরাপত্তার নিদর্শন হিসেবে স্থাপন করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

৮) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন স্পর্শ মু'মিনের হৃদয়ে সুন্নাতের তাজিম-সম্মান বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করে। কেননা নিছক পাথরকে চুম্বন করার মাহাত্ম্য কী তা আমাদের বুঝের আওতার বাইরে। তবুও আমরা চুম্বন করি, যেহেতু রাসূল (ﷺ) করেছেন।

৯) তাওয়াফ আল্লাহ তা'আলা কেন্দ্রিক জীবনের নিরন্তর সাধনাকে বুঝায়। অর্থাৎ- একজন মু'মিনের জীবন মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে কেন্দ্র করে অবর্তিত। এক মহান আল্লাহকে সকল কাজের কেন্দ্র বানিয়ে যাপিত হয় মু'মিনের সমগ্র জীবন। বায়তুল্লাহর চার পাশে প্রদক্ষিন মহান আল্লাহর মহান নিদর্শনের চার পাশে ঘোরা। তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চার পাশে ঘোরা। তাওহীদ নির্ভর জীবনযাপনের গভীর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।

১০) আল্লাহ তা'আলা নারীকে করেছেন সম্মানিতা। সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর, মহান আল্লাহর রহমত-মদদ কামনায় একজন নারীর সীমাহীন মেহনত, দৌড়ঝাঁপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যে শ্রম-মেহনতের পর প্রবাহ পেয়েছিল রহমতের ফোয়ারা 'যমযম'।

১১) উকুফে আরাফা কিয়ামতের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে।

উপসংহার

হজ্জ শুধুই 'ইবাদত নয়। বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। হজ্জের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্র হয়। ভাষা-বর্ণের ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক-জাতীয় পরিচয়ের পার্থক্য ও ভৌগোলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব মুসলিমের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ও সুসংহত হয় পবিত্র হজ্জ উদযাপনে। বিশ্ব মুসলিমের পারস্পরিক দুঃখ-অভাব, অভিযোগ-সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া ও তার সমাধানের সুযোগ হয় পবিত্র হজ্জের বিশ্ব সম্মিলনে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক সংহতিতেও হজ্জের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জের মৌসুমে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় বিশেষত সৌদি আরবের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। এ সময় ব্যবসায়ী বিশ্ব মুসলিম নেতারা আলাপ-আলোচনা-চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিম নেতারা পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারেন। এতে বিশ্ব মুসলিম নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতি গড়ে উঠতে পারে। হজ্জের সময় তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম সমাজ-সংস্কৃতিকে সুসংহত ও সমৃদ্ধ করতে পারেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত ও সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের শিকার মুসলিম বিশ্বের জন্য হজ্জ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। হজ্জ মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং অধিকার আদায়ের সুযোগ করে দেয়। হজ্জ মৌসুমে মুসলিম বিশ্বের নেতারা বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মতভেদ নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়া হজ্জের বিশ্ব সম্মিলন থেকে মুসলিম নেতারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আধিপত্যবাদীদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদসহ প্রচারিত অন্যান্য অপবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের করণীয় সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনাও দিতে পারেন তারা। ❑

প্রবন্ধ

তুহফায়ে যাইফুর রহমান

–আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান*

হজ্জ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে লক্ষাধিক মুসলিম হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কাবার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়! অধিকাংশ হজ্জযাত্রী জানেন না, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে হজ্জে মাবরূরের আহকাম-আরকান এবং অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। উল্লেখ্য যে, এই গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতের একটি রুকন ছুটে গেলেই হজ্জ বা 'উমরাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে, পণ্ড হবে সকল শ্রম, অর্থ ও সময়। নতুন করে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে। বিধায়, এ বছর যে সব যাইফুর রহমান হজ্জ-'উমরাহ্ পালন করতে কাবা পথে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, তাদের বিশুদ্ধ হজ্জ-'উমরার পদ্ধতি পেশ করা হলো–

রুকন পরিচিতি :

'উমরার রুকন তিনটি : ১. ইহরাম বাঁধা, ২. তাওয়াফ করা ও ৩. সা'ঈ করা।

হজ্জের রুকন চারটি : ১. ইহরাম বাধা, ২. আরাফায় অবস্থান করা, ৩. তাওয়াফে ইফাযাহ বা যিরারা করা এবং ৪. সাঈ করা।

রুকনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

১. ইহরাম বাঁধা : অন্তরে নিয়ত করতঃ হজ্জ বা 'উমরাহ্-এ প্রবেশের ঘোষণা দিয়ে তালবিয়াহ পাঠ শুরু করাকে ইহরাম বলা হয়। 'উমরার জন্য নির্ধারিত মীকাত হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর হজ্জের জন্য– হজ্জে কিরান ও ইফরাদ হলে মীকাত হতে এবং তামাত্তু হজ্জ হলে ৮ই যিলহজ্জ স্বীয় অবস্থান-স্থল হতে ইহরাম বাঁধতে হবে।

২. তাওয়াফ করা : কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ﴾

"তারা যেন প্রাচীন গৃহ (কাবায়) তাওয়াফ করে।"[২০] হজ্জ ও 'উমরার জন্য তাওয়াফ ফর্‌য বা অপরিহার্য। 'উমরার প্রথম কাজ হলো কাবায় তাওয়াফ করা, আর হজ্জের জন্য ১০ তারিখে যে তাওয়াফ করা হয়, তাকে তাওয়াফে ইফাযাহ বা তাওয়াফে যিয়ারাহ বলে।

৩. সা'ঈ করা : সাফা পর্বত হতে মারওয়া পর্বত (এক চক্কর) এবং মারওয়া হতে সাফা (এক চক্কর) এরূপ সাত চক্করে সা'ঈ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ".

"হে মানব সকল! তোমরা (সাফা-মারওয়ায়) সা'ঈ করো, কেননা সা'ঈ করা তোমাদের জন্য ফর্‌য করে দেয়া হয়েছে।"[২১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

"সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ না করলে আল্লাহ তা'আলা কারো হজ্জ ও 'উমরাহ্কে পূর্ণ করে দেন না।"[২২]

সুতরাং হজ্জ ও 'উমরার জন্য সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করা ফর্‌য। 'উমরার জন্য তাওয়াফের পরই সা'ঈ করতে হয়। আর তামাত্তু হজ্জে ১০ তারিখে তাওয়াফে ইফাযার পর সা'ঈ করা ফর্‌য। ইফরাদ ও কিরান হজ্জে তাওয়াফে কুদুমের সাথে সা'ঈ না করলে ১০ তারিখে তাওয়াফে ইফাযার পরে অবশ্যই সা'ঈ করতে হবে। আর তাওয়াফে কুদুমের সাথে সা'ঈ করা থাকলে সেটাই হজ্জের সা'ঈ হিসেবে যথেষ্ট হবে।[২৩]

উপরোক্ত তিনটি রুকন 'উমরাহ্ ও হজ্জ উভয়ের জন্য। আর হজ্জের জন্য অতিরিক্ত বিশেষ রুকন হলো আরাফায় অবস্থান করা।

৪. আরাফায় অবস্থান করা : ৯ই যিলহজ্জ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করার মূল সময়। এটা হজ্জের অন্যতম ফর্‌য কাজ। নবী (ﷺ) নিজে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন :

---

* *সহযোগী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা।*

[২০] *সূরা আল হাজ্জ : ২৯।*
[২১] *দারাকুত্বনী- ২/২৫৫, হা. ২৫৮২; বাইহাক্বী- ৫/৯৭, সহীহ।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৯০; মুসলিম- হা. ৩০৮০, ২৫৯/১২৭৭।*
[২৩] *তাব্‌সীরুন নাসিক- ৩১ পৃ.।*

«اَلْحَجُّ عَرَفَةُ».

"আরাফায় অবস্থানই হলো হজ্জ।"[২৪]

যথাসময়ে অবস্থান করতে না পারলে রাতে ফজরের পূর্বে অবস্থান করতে পারলেও ফর্‌য আদায় হয়ে যাবে।[২৫] পক্ষান্তরে আরাফায় অবস্থান না করলে হজ্জ হবে না।

হজ্জ পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি : মহানবী (ﷺ) স্বীকৃত তিন পদ্ধতিতে হজ্জ সম্পাদন করা যায়। যথা- ১. হজ্জে তামাত্তু, ২. হজ্জে কিরান এবং ৩. হজ্জে ইফরাদ। তবে সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি তামাত্তু হজ্জ। নিম্নে হজ্জ পালনের তিনটি পদ্ধতির বিবরণ প্রদত্ত হলো–

তামাত্তু হজ্জ : হজ্জের মাসসমূহ অর্থাৎ- শাওয়াল, যিলক্বাদ ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে শুধু 'উমরার ইহরাম বেঁধে 'উমরার কাজ সম্পন্ন করে (ইহরাম খুলে) হালাল হয়ে পুনরায় যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে মক্কা হতে ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ সম্পাদন করাকে তামাত্তু হজ্জ বলা হয়। অর্থাৎ- প্রথমে 'উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে 'উমরার কার্যাবলী সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া। অতঃপর হজ্জের জন্য পুনরায় ইহরাম বাঁধা।

তামাত্তু হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি :

ক. মীকাত থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সা'ঈ করে মাথার চুল হলক বা কসর (মুণ্ডন বা ছাঁটা) করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং হজ্জ পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করা। অতঃপর ৮ যিলহজ্জ নিজ অবস্থান স্থল হতে নতুনভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করা।

তবে 'উমরা সম্পাদনের পর হজ্জের পূর্বেই মদীনা গমন করলে মদীনা থেকে মক্কায় আসার পথে চাইলে মদীনার মীকাত হতে কিংবা আবয়ারে 'আলী নামক জায়গা থেকে 'উমরার নিয়তে পুনরায় ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসা এবং 'উমরাহ্ সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া। এটি আবশ্যকীয় 'আমল নয়; বরং ইখতিয়ারভুক্ত। তারপর ৮ যিলহজ্জ হজ্জের জন্য নতুনভাবে ইহরাম বেঁধে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করা।

কিরান হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি : 'উমরার সাথে যুক্ত করে একই ইহরামে 'উমরাহ্ ও হজ্জ আদায় করাকে কিরান হজ্জ বলে। অর্থাৎ- মীকাত থেকে হজ্জ ও 'উমরার জন্য এক সঙ্গে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে প্রথমে 'উমরাহ্ আদায় করা ও ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। হজ্জের সময় হলে একই ইহরামে মিনা-আরাফায় গমন ও হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

অথবা, মীকাত থেকে শুধু 'উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর 'উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজ্জের নিয়ত 'উমরার সাথে যুক্ত করে নেয়া। 'উমরার তাওয়াফ-সা'ঈ শেষ করে, ইহরাম অবস্থায় হজ্জের অপেক্ষায় থাকা ও ৮ যিলহজ্জ একই ইহরামে মিনায় গমন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করা।

ইফরাদ হজ্জ : হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরাহ্ না করে শুধু হজ্জ করাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এ ক্ষেত্রে মীকাত থেকে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাধতে হয়। মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা। ইচ্ছা হলে এ তাওয়াফের পর সা'ঈও করা যায়। সে ক্ষেত্রে হজ্জের ফর্‌য তাওয়াফের পর আর সা'ঈ করতে হবে না। তাওয়াফে কুদুম অর্থাৎ- আগমনী তাওয়াফের পর ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। অতঃপর ৮ জিলহজ্জ একই ইহরামে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া। ইফরাদ হজ্জকারীকে হাদী অর্থাৎ- পশু যবেহ করতে হয় না। তাই ১০ যিলহজ্জ কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা মুণ্ডন করে ইফরাদ হজ্জকারী হালাল হয়ে যাবেন।

হজ্জের উত্তম নিয়ম : উক্ত তিন প্রকারের যে কোনো নিয়মে হজ্জ সম্পাদন করলে ফর্‌য আদায় হয়ে যাবে, তবে উত্তম হলো তামাত্তু হজ্জ এবং তামাত্তু হজ্জই করা উচিত। কারণ মহানবী (ﷺ) বিদায় হজ্জে তামাত্তু হজ্জ করারই নির্দেশ দিয়েছেন।[২৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন : "হে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসারীরা! তোমাদের মধ্যে কেউ হজ্জের নিয়ত করলে সে যেন তার হজ্জে (প্রথমে) 'উমরার ইহরাম বাঁধে।[২৭]

সাহাবীগণ যখন কিরান হজ্জ ভঙ্গ করে তামাত্তু হজ্জ করতে ইতস্ততবোধ করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের যা নির্দেশ দিয়েছি তাই করো। আমি যদি কুরবানীর পশু

[২৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩০১৫, সহীহ।*
[২৫] *প্রাগুক্ত।*
[২৬] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*
[২৭] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ২৪৬৯।*

প্রেরণ না করতাম তাহলে তোমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছি আমিও তাই করতাম। কিন্তু আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারছি না; তাই বাধ্য হয়ে আমাকে কিরান করতে হচ্ছে। অতঃপর সাহাবীগণ (যারা সাথে কুরবানীর পশু আনেননি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশে তারা) কিরান ভঙ্গ করে তামাত্তু হজ্জ করলেন।[২৮]

অতএব তামাত্তু হজ্জ শুধু উত্তমই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশের আলোকে তামাত্তুই করা উচিত। এছাড়াও তামাত্তু হজ্জে 'উমরাহ্ হতে হালাল হয়ে ৮ তারিখ এর পূর্ব পর্যন্ত ইহরামমুক্ত জীবনযাপন করা যায়, এটা হাজীদের জন্য সহজতর বিষয়।

৮ হতে ১৩ যিলহজ্জের কার্যাবলী :

৮ যিলহজ্জে করণীয় : নিজ বাসস্থান বা অবস্থান থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করে সূর্যোদয়ের পর 'মিনা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া। অতঃপর সেখানে যোহর, 'আসর, মাগরিব, 'ঈশা এবং পরদিনের ফজরের সালাত প্রতি ওয়াক্তের নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। উল্লেখ্য যে, যোহর, 'আসর ও 'ঈশার সালাতে কসর করা। অর্থাৎ- নির্দিষ্ট সময়ে কসর করে পড়বে; জমা করবে না।

৯ যিলহজ্জে করণীয় : সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফাহর উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া। আরাফায় পৌঁছে যোহর-'আসর জমা ও কসর করা। অর্থাৎ- প্রথমে যোহরের ২ রাকআত আদায় করে আবার ইকামাত দিয়ে 'আসরের ২ রাকআত পড়া।

সূর্যাস্তের পর মুযদালিফা'র উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে সেখানে পৌঁছে মাগরিব-'ঈশা একত্রে আদায় করা। অতঃপর সেখানে রাত যাপন করে আওয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ- অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করা এবং আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাতে মশগুল থাকা।

উল্লেখ্য যে, এ সময় নির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। সুতরাং নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আরবীতে না পারলে নিজ নিজ ভাষায় দু'আ-মুনাজাত করতে হবে।

[২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৬৮।*

বড় জামারায় নিক্ষেপের জন্য ৭টি কংকর বা ছোট পাথর এখান থেকেই কুড়াতে হবে।

১০ যিলহজ্জে (ঈদের দিন) করণীয় : মিনা'য় ফিরে এসে বড় জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে পশু কুরবানী করতে হবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করে হালাল বা ইহরামমুক্ত হওয়ার জন্য ইহরামের কাপড় খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতে হবে।

অতঃপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাযা করতে হবে। তবে এদিন সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখেও এ তাওয়াফ করা যাবে এবং তৎসঙ্গে সা'ঈ করতে হবে।

১১ যিলহজ্জে করণীয় : মিনা'তে দুপুরের পর সিরিয়াল ঠিক রেখে প্রথমে ছোট জামারাতে, অতঃপর মধ্যম জামারাতে এবং শেষে বড় জামারাতে– প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে এবং ঐদিন মিনাতেই রাত যাপন করতে হবে।

১২ যিলহজ্জে করণীয় : পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সিরিয়াল অনুসারে ৩টি জামারার প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করতে হবে। সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা সম্ভব না হলে ঐ রাত মিনাতেই অবস্থান করতে হবে।

১৩ যিলহজ্জে করণীয় : যারা ১২ যিলহজ্জে মিনায় রাত যাপন করেছেন তারা ঐদিন দুপুরের পর পূর্বের নিয়ম অনুসারে ৩টি জামারাতে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করবেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে গিয়ে বিদায়ি তাওয়াফ করবেন। এভাবে ৮ যিলহজ্জ থেকে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে হজ্জের মৌলিক কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। এটাই হজ্জ পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি।

'উমরাহ্ আদায়ের পদ্ধতি : তালবিয়া পড়তে পড়তে পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এবং মাসজিদুল হারামের বিল্ডিংটির যেকোন দরজা দিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে হবে। প্রথমে ডান পা এগিয়ে দিয়ে (মাসজিদে প্রবেশের দু'আটি) পড়বে। আর তা হলো–

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফির লি যুনূবি ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন।

অতঃপর তাওয়াফ শুরু করতে হবে। বায়তুল্লাহ দেখামাত্র দু'হাত উঠানোর ব্যাপারে যে কথাটি প্রচলিত তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।[২৯] তবে বায়তুল্লাহ (কাবা) দৃষ্টির আওতায় এলে দু'আ করার অনুমতি রয়েছে। 'উমার (রাঃ) যখন বায়তুল্লাহর দিকে তাকাতেন তখন নীচের দু'আটি পড়তেন–

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু ফাহাইয়িনা রব্বানা বিস্ সালামি।[৩০]

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার নিকট থেকেই শান্তি এসে থাকে। অতএব হে প্রভু! আপনি আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন –আমীন।

ইতমিনানের সাথে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে :

১. ছোট-বড় সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা।

২. তাওয়াফের শুরুতে মনে মনে নিয়ত করা। বিভিন্ন পুস্তকে তাওয়াফের যে নিয়ত লেখা আছে তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং ভিত্তিহীন।

৩. সতর ঢাকা অবস্থায় তাওয়াফ করা।

৪. হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন-স্পর্শ) অথবা ইশারা করে তাওয়াফ শুরু করা এবং হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে তাওয়াফ শেষ করা।

৫. হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র ডান হাত উঠিয়ে ইশারা করা ও «بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ» (বিস্মিল্লা-হি আল্লাহু আকবার বলা) বলা। এক্ষেত্রে হাতে হাতে চুমু খাওয়া যাবে না।

৬. হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা।

৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কাবার অন্য কোন অংশ তাওয়াফের সময় স্পর্শ না করা। তাওয়াফ শেষ হলে বা অন্য কোনো সময় মুলতাযামের জায়গায় হাত বাহু গণ্ডদেশ ও বক্ষ রাখা যেতে পারে।

৮. মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ না করা।

৯. পুরুষদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পবিত্র কাবার কাছ দিয়ে তাওয়াফ করা।

১০. নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে যথাসাধ্য পৃথক হয়ে তাওয়াফ করা।

১১. আল্লাহভীতি ও আন্তরিকতার সাথে তাওয়াফ করা এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা।

১২. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে নিম্নের দু'আ পড়া :

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

"রব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকিনা 'আযাবান না-র।"

১৩. প্রত্যেক তাওয়াফে ভিন্ন ভিন্ন দু'আ আছে এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বিরত থাকা।

১৪. সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করা।

১৫. তাওয়াফ করার সময় নারীদের স্পর্শ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা।

১৬. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রা-হীমের পেছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করা। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করা।

১৭. সালাত শেষে যম্যমের পানি পান করা ও কিছু মাথায় দেয়া।

অতঃপর সাফা পাহাড় হতে সা'ঈ শুরু করা এবং মারওয়া পাহাড়ে এসে সা'ঈ শেষ করা। সাফা হতে মারওয়া এক সা'ঈ বলে গণ্য হবে– এভাবে সাতবার সা'ঈ করা। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেঁটে ইহরামমুক্ত হয়ে হালাল হয়ে যাওয়া। ❑

[২৯] *শাওকানী- নাইলুল আওতার, ৯৬০ পৃ.।*
[৩০] *শাওকানী- নাইলুল আওতার, ৯৬০ পৃ.।*

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সঠিক সময় ও নির্দেশনা

–প্রকৌশলী মুহা. আরীফুল ইসলাম*

মহান রাব্বুল ‘আলামীন মানুষ ও জিন্ জাতিকে শুধুমাত্র তাঁর ‘ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন[৩১] এবং সর্বশেষ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনুগত্য করতে[৩২]। সেই মহান আল্লাহর ‘ইবাদতের মধ্যে সালাত হলো গুরুত্বপূর্ণ মনোদৈহিক ‘ইবাদত। উম্মাতে মুহাম্মাদী’র জন্য মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব হলো কুরআন মাজীদ, যাতে আল্লাহ তা‘আলা সালাত কায়িম করার নির্দেশ দিয়েছেন ৮২ বার তাগিদ দিয়ে। কিন্তু কোনো আয়াতে বলা নেই যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো। তাহলে কিভাবে বলা আছে? আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দলিল আমরা কোথায় পেলাম? আবার যারা শুধু কুরআন মাজীদকেই অনুসরণযোগ্য দলিল হিসেবে যথেষ্ট মনে করেন, হাদীসের প্রয়োজনবোধ করেন না, তারা এর কি জবাব দেবেন?

(১) সর্বপ্রথম সূরা আল বাক্বারাহ্তেই সালাতের নির্দেশ রয়েছে কিন্তু এ সূরায় কোথাও সালাতের ওয়াক্ত বলা হয়নি। তাহলে ওয়াক্তের নির্দেশ কোথায় থেকে এলো?

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

“নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু’মিনদের উপর ফর্য।”[৩৩] চলুন দেখি সূরা হূদ-এর ১১৪ নং আয়াত। সেখানে বলা হলো–

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾

“দিনের দু’প্রান্তে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়েম করো। নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়।”

ব্যাখ্যা : এখানে দিনের দু’প্রান্ত বা সকাল ও সন্ধ্যায় বলতে ফজর ও মাগরিব সালাত এবং রাতের প্রথম অংশের সালাত হলো ‘ইশা। সুতরাং এই এক আয়াতেই তিন বা চার ওয়াক্ত সালাতের হুকুম পাওয়া যাচ্ছে। দিনের প্রথমভাগের সালাতের ব্যাপারে সবাই একমত যে, তা ফজরের সালাত। কিন্তু মতপার্থক্য রয়েছে যে, দিনের শেষ প্রান্তের সালাত বলতে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, তা মাগরিবের সালাত।[৩৪]

ভিন্নমতে হাসান বসরী, ক্বাতাদাহ্ ও দাহহাক বলেছেন, দিনের শেষ প্রান্তের সালাত হলো ‘আসরের সালাত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দিনের দু’প্রান্ত বলতে যোহর ও ‘আসরের সালাত-এর সময়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, ফজরের সালাতের সময় দিন হয়নি (সূর্য ওঠেনি) আর মাগরিবের সালাতের সময় দিন নেই (সূর্য ডুবে গেছে)। রাতের কিছু অংশের সালাত বলতে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সেটি ‘ইশার সালাত। কিন্তু হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনু কা’ব, ক্বাতাদাহ্, যাহহাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বলেছেন যে, সেটি মাগরিব ও ‘ইশা।[৩৫]

তা যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, এ আয়াত থেকে চার ওয়াক্তের সালাতের সময় পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে বাকী রইল যোহরের সালাত। ইবনু কাসীর-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই নির্দেশ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্য হওয়ার আগের। তখন দু’ওয়াক্ত সালাত-ই ফর্য ছিল : সূর্য ওঠার আগের (ফজর) এবং সূর্য ডুবার আগের (‘আসর)। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সালাতের হিফাযতের কথা বলতে গিয়ে ‘সালাতুল উসতা’-এর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যেটি অধিকাংশের মতে ‘আসরের সালাত। আর রাতের সালাত উম্মতে মুহাম্মাদী’র জন্য বিশেষ একটি নিয়ামত বা সুযোগ। অথবা যোহরের সালাতের ব্যাপারে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, আর তা আমরা দেখি সূরা ইস্রা’র ৭৮ নং আয়াতে।

(২) এরপর বানী ইসরাঈল-এর ৭৮ নং আয়াতে বলা হলো–

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

“সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করো, আর ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন করো), নিশ্চয়ই ফজরের সালাতের কুরআন পাঠ (মালাইকাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।”

ব্যাখ্যা : এখানে ‘সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময়’ অর্থ হলো যোহরের সময় শুরু হলো। ‘রাত্রির গাঢ় অন্ধকার’ বলতে ‘ইশা এবং ফজর দু’ওয়াক্তই এর মধ্যে পড়ল। কারণ, হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ‘গাসাক্ব’ থাকতেই ফজরের আউয়াল ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ ফজরের সালাত ‘গালাস’-এ না হয়ে ‘ইসফার’ বা চারিদিক ফর্সা হওয়ার সময় থেকে আদায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন।

---

* *বিএসসি (ত ও ই), টাংগাইল।*

[৩১] *সূরা আয্ যা-রিআ-ত।*

[৩২] *সূরা আন্ নিসা।*

[৩৩] *সূরা আন্ নিসা : ১০৩।*

[৩৪] *তাফসীরে তাবারী, কুরতুবী, ইবনু কাসীর।*

[৩৫] *ইবনু কাসীর।*

সুতরাং এ আয়াতে সরাসরি সালাতের নাম উল্লেখ না থাকলেও যোহর থেকে ফজর (যোহর, 'আসর, মাগরিব, 'ইশা এবং ফজর) মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা পাওয়া যাচ্ছে।

(৩) সূরা ত্ব-হা- : ১৩০–

﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾

"সুতরাং এরা যা বলে তার উপর ধৈর্যধারণ করো এবং তাসবীহ পাঠ করো তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে, সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং তাসবীহ পাঠ করো রাতের কিছু অংশে ও দিনের প্রান্তসমূহে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।"

কোনো কোনো মুফাসসিরগণের মতে তাসবীহ (প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা) বলতে সালাত এবং এ আয়াত হতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাত, সূর্য ডুবার আগে 'আসরের সালাত নামায, 'রাত্রিকালে' বলতে মাগরিব ও 'ইশার সালাত এবং 'দিনের প্রান্তভাগসমূহ' বলতে যোহরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, যোহরের সময় দিনের প্রথম ভাগের শেষ প্রান্ত এবং দিনের শেষবাগের প্রথম প্রান্ত। আর কিছু উলামা'র মতে, এই সময়গুলোতে সাধারণভাবে মহান আল্লাহর মহিমা তথা প্রশংসা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে; যার মধ্যে সালাত, কুরআন পাঠ, যিক্‌র, দু'আ ও নফল 'ইবাদত সবই শামিল।

(৪) সূরা আর্ রূম : ১৭–

﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।"

কোনো কোনো আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত পেশ করলেন। 'ফাসুবহানাল্লাহি হীনাত তুমসুন' এর অর্থ মাগরিবের সালাত, 'ওয়া হীনাত তুছ্ববিহুন' শব্দে ফজরের সালাত, 'আশিয়্যা' দ্বারা 'আসরের সালাত এবং 'হীনাত তুযহীরুন' শব্দে যোহরের সালাত উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে–

﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾

"ওয়া মিম বা'দি সালাতিল 'ইশায়ি"[৩৬] মানে 'ইশা'র সালাতের কথা এসেছে।[৩৭]

[৩৬] *সূরা আন্ নূর : ৫৮।*

[৩৭] *মুস্তাদরাকে হাকিম- ২/৪৪৫, হা. ৩৫৪১।*

অবশ্য হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে 'হীনাত তুমসুন' শব্দে মাগরিব ও 'ইশা উভয় সালাতকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।[৩৮] সে হিসেবে এ সূরাতেই সমস্ত সালাতের উল্লেখ আছে বলা যায়।

(৫) সূরা ক্বা-ফ-এর ৩৯ নং আয়াতে বলা হলো–

﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ﴾

"অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।"

ব্যাখ্যা : এখানে কেউ হয়ত কূটতর্ক জুড়ে দিতে পারেন যে, এখানে তো সালাতের কথা বলা হয়নি, এর দ্বারা যিকির করা'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সালাতেও তো আমরা রাব্বুল 'আলামীনের প্রশংসা (হামদ), পবিত্রতা (তাসবীহ) এবং বড়ত্ব ঘোষণা করে থাকি। আর সালাত কায়িমের অর্থে নিলে এ আয়াতে ফজর ও 'আসর ওয়াক্তের কথা আসে।

এভাবে বিভিন্ন সূরায় দেয়া আল্লাহর নির্দেশগুলো একত্রে করলে সূর্য উদয়ের আগে থেকে সূর্য ডুবার পর এবং রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সালাত মোট পাঁচ ওয়াক্ত-ই হয়।

এবার চলুন হাদীসের দিকে মনোযোগ দেই। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাত শিখিয়ে দিলেন কে? সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে, তা-ই বা কে শেখালেন? এ কাজ স্বয়ং সালাতের মালিক, মহান প্রভু, রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহপাক শিখিয়েছেন জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম)-কে। আর জিবরাইল (আলাইহিস্ সালাম) দুনিয়ার মাটিতে এসে, মক্কা মুয়াযযমায় এসে সরাসরি ইমামতি করে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাত আদায় করা শিখিয়েছেন দুইদিন, দুই রকম সময়ে : একদিন পাঁচ ওয়াক্ত-ই আউয়্যাল ওয়াক্তে (যে মুহূর্তে ওয়াক্ত শুরু হয়), আর পরের দিন একবারে শেষ সময়ে, মানে যার পরে আর সময় নেই। আর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আপনার উম্মতের জন্য এই দুই সময়ের মাঝামাঝি সময়।

প্রায় সবাই এটা জানেন যে, মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারী/উম্মতদের জন্য প্রথমে দৈনিক ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য (অবশ্যপালনীয়, অমান্য বা ত্যাগ করলে কুফ্‌রী হবে) করেন। ফিরে আসার সময় মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সাথে দেখা হলে তিনি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পরামর্শ দেন এই সংখ্যা কমিয়ে আনার আবেদন (মহান আল্লাহর নিকট) করতে। ... তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দফায়

[৩৮] *বাইহাক্বী- সুনানুল কুবরা, ১/৩৫৯।*

দফায় মহান আল্লাহর নিকট আবেদন করে সালাতের ওয়াক্ত ০৫ (পাঁচ)-এ কমিয়ে আনেন।[৩৯]

সালাতের ওয়াক্তসমূহ– ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বাইতুল্লাহ’র নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) দু’বার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) সূর্য ঢলে (পশ্চিম আকাশে) যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে তিনি যোহর সালাত আদায় করলেন। তখন (পূর্ব দিকে) জুতার ফিতার সমান ছায়া দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ‘আসরের সালাত আদায় করলেন, যখন (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া তার সমান হয়। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন, যখন সিয়ামপালনকারী ইফতার করে থাকে। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে ‘ইশার সালাত আদায় করলেন, যখন শাফাক্ব (লাল শুভ্র রং) অন্তর্হিত হয় এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়।

(দ্বিতীয়বারে) পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন, (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া যখন সমান হলো। তিনি আমাকে নিয়ে ‘আসর সালাত আদায় করলেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন যখন সিয়ামপালনকারী’র ইফতারের সময় হয়। তিনি আমাকে নিয়ে ‘ইশা’র সালাত আদায় করলেন রাাতের তৃতীয়াংশে এবং ফজর সালাত আদায় করলেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত এবং সালাতের ওয়াক্তসমূহ এই দু’সময়ের মাঝখানেই নিহিত।[৪০]

সালাতের সময় ও তার গুরুত্ব– আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

“নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু’মিনদের উপর ফর্‌য।”[৪১]

ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয (রহিমাহুল্লাহ) একদা কোনো এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন উরওয়াহ্ ইবনু যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) তার নিকট গেলেন এবং তার নিকট বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরাহ্! একি? তুমি কি অবগত নও যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন, আর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও সালাত আদায় করলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি এজন্য আদিষ্ট হয়েছি। ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয (রহিমাহুল্লাহ) উরওয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন, তুমি যা রিওয়ায়াত করছ তা একটু ভেবে দেখো। জিবরাঈল-ই কি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন? উরওয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, বশীর ইবনু আবূ মাস‘ঊদ (রহিমাহুল্লাহ) তার পিতা হতে এমনই বর্ণনা করতেন।[৪২]

উরওয়াহ্ ইবনু যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর খিলাফাত কালের বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরাহ্ ইবনু শু’বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফার আমীর থাকাকালে একদা ‘আসরের সালাত আদায় করতে দেরি করে ফেললে যায়দ ইবনু হাসানের দাদা বাদ্রী সাহাবী আবূ মাস‘ঊদ ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, আমি এভাবেই সালাত আদায় করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। বাশীর ইবনু আবূ মাস‘ঊদ তার পিতার নিকট হতে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করতেন।[৪৩]

সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের মর্যাদা : আবূ ‘আমর শায়বানী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ বাড়ির মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ‘আমল মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ‘যথাসময়ে সালাত আদায় করা। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, অতঃপর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ (আল্লাহর পথে জিহাদ)। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এগুলো তো আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও অধিক জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।[৪৪]

---

[৩৯] *মুসলিম; হাদীসে কুদসী- হা. ১৩৯/৮, আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।*
[৪০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৯৩।*
[৪১] *সূরা আন্ নিসা : ১০৩।*
[৪২] *বুখারী- হা. ৩২২১, আ. প্র., হা. ৪৯১, ই. ফা. বাং, হা. ৪৯৭।*
[৪৩] *বুখারী- হা. ৫২১, আ. প্র., হা. ৩৭১০, ই. ফা. বাং, হা. ৩৭১৪।*
[৪৪] *মুসলিম- ১/৩৬, ৮৫; আহমাদ- ৪২২৩; আ.প্র., ৪৯৬, ই.ফা.বাং, ৫০২।*

এবার দেখি হাদীসগুলো কোন কোন কিতাবে কত নম্বরে এসেছে– বুখারী- হা. ৩৪৯, ১৬৩৬, ৩৩৪২; মুসলিম- ১/৭৪, হা. ১৬৩; আহমাদ- হা. ২১১৯৩; বুখারী- আ. প্র., ৩৩৬, ই. ফা. বাং, ৩৪২।

ইস্‌রা মি'রাজে কীভাবে সালাত ফর্‌য হলো?

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মিরাজের রাতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফর্‌য করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হলো– হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট কথার কোনো অদল বদল নেই। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব রয়েছে।[৪৫]

সালাত ফর্‌য হওয়া ও সালাতসমূহের হিফাযাত করা : আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণনাকারীদের সনদের মতভেদ প্রসঙ্গে এবং এ ব্যাপারে তাদের শব্দাবলীর ভিন্নতার আলোকে। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য করেছি। আর আমি আমার পক্ষ হতে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে এসব সালাতের হিফাযত করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি এর হিফাযত করবে না তার জন্য আমার পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।[৪৬]

এক নজরে সালাতের ওয়াক্তসমূহ–

ফজরের ওয়াক্ত : 'সুবহি সাদিক' থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা 'গালাস' বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র 'ইসফার' বা চারদিকে ফর্সা হওয়ার সময়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফজরের সালাত খুব অন্ধকারে আদায় করাই তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিলো।[৪৭] অতএব ফজরের সালাত 'গালাস' বা খুব ভোরের অন্ধকারে আদায় করাই উত্তম।

ইমাম ত্বাহাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ি কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক ফজরের সালাত অন্ধকারে শুরু করা উচিত এবং একটু ফর্সা হলেই শেষ করা উচিত। এটাই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের অভিমত।[৪৮]

যোহরের ওয়াক্ত : সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোনো বস্তুর নিজস্ব ছায়ার একগুণ হলে ওয়াক্ত শেষ হয়।[৪৯] ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ থেকেও সহীহ হাদীসে বর্ণিত এ মতের সমর্থন রয়েছে।[৫০]

'আসরের ওয়াক্ত : কোনো বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিগুণ থেকে শুরু করা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত 'আসরের সময়[৫১] রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সূর্য যখন হলুদ রং হয় এবং শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখানে এসে যায় তখন মুনাফিকরা সালাত পড়ে।[৫২] সুতরাং সূর্য্যের আভা একটু হলদে রং হয়ে আসার পূর্বেই 'আসর সালাত আদায় করা উচিত।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আসরের ওয়াক্তের শুরু হলো এক ছায়া থেকে। ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম যুফার ও অন্য তিনজন ইমামের মতও তাই। হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম ত্বাহাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা এটাই গ্রহণ করি।[৫৩] গুরারুল আকরে এটাই গৃহীত হয়েছে। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বর্ণনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে এটাই হচ্ছে সঠিক 'নাস' ও হাদীস।[৫৪]

ফাতাওয়াহ হাম্মাদিয়াতে আছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের ফাতাওয়াই হানাফীদের ফাতাওয়াহ। অর্থাৎ- যোহরের শেষ সময় ও 'আসরের শুরু হলো এক ছায়া থেকে। মুলতাকাব আবহুরে আছে, আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর উক্ত দু' সাতের এ মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মোল্লা আবিদ সিন্ধী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দু' সাতের ফাতাওয়ার প্রতি ইমাম আবূ হানীফার মত পাল্টানোর কথা ফাতওয়াহ শামী, কিতাবুল আনীস এবং আল-জাওয়াহারুল মুনীর শারাহ তানভীরুল আবসার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৫]

অতএব সহীহ হাদীস এবং চার ইমামসহ ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর ছায়ার একগুণ হওয়ার পর থেকে 'আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হলে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত 'আসরের সালাত আদায় জায়িয আছে।[৫৬]

মাগরিবের ওয়াক্ত : সূর্য ডোবার পরই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।[৫৭]

---

[৪৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- পরিচ্ছেদ– ৪৭. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত নামায ফর্‌য করেছেন, হা. ২১৩।*
[৪৬] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৪৮; সুনান আবূ দাউদ- পরিচ্ছেদ– ৯. সালাতসমূহের হিফাযাত করা, হা. ৪৩০।*
[৪৭] *সুনান আবূ দাউদ।*
[৪৮] *দেখুন, শারহু মা'আনিল আসার- ১/৯০।*
[৪৯] *সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[৫০] *দেখুন, হিদায়া- ১/৮১।*
[৫১] *সহীহ মুসলিম।*
[৫২] *সহীহ মুসলিম।*
[৫৩] *দেখুন, ত্বাহাভী- ৭৮ পৃ.।*
[৫৪] *দেখুন, দুররে মুখতার- ১/৫৯।*
[৫৫] *দেখুন, মাওয়াহিবু লাতীফিয়্যাহ- পৃ. ২০৪; যাহরাতু রিয়াযিল আবরার- পৃ. ৬৫।*
[৫৬] *দেখুন, নায়ল- ২/৩৪-৩৫।*
[৫৭] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*

'ইশার ওয়াক্ত : 'ইশার ওয়াক্ত পশ্চিম আকাশের লাল আভা দূর হবার পর থেকে শুরু হয় এবং অর্ধেক রাতে শেষ হয়[৫৮]। তবে জরুরি কারণবশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত 'ইশার সালাত আদায় করা জায়িয আছে।[৫৯]

সালাতের নিষিদ্ধ সময় : সূর্যোদয়, ঠিক দুপুরে- যতক্ষণ না সূর্য একটু ঢলে পড়ে, ও সূর্যাস্তকালে সালাত শুরু করা সিদ্ধ নয়।[৬০] অনুরূপভাবে 'আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।[৬১] তবে ফজর ও 'আসর সালাতের পরে কাযা সালাত আদায় করা জায়িয আছে।[৬২] বিভিন্ন হাদীসের আলোকে অনেক বিদ্বান নিষিদ্ধ সময়গুলোতে 'কারণ বিশিষ্ট' সালাতসমূহ আদায় করা জায়িয বলেছেন। যেমন- তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযূ, সূর্য গ্রহণের সালাত, জানাযার সালাত ইত্যাদি।[৬৩] জুমু'আর সালাত ঠিক দুপুরের সময় জায়িয আছে।[৬৪] অমনিভাবে কা'বাতে সকল সময় সালাত ও তাওয়াফ জায়িয[৬৫]।[৬৬]

নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাকআত পায় সে ফজরের সালাত পেয়ে গেলো এবং যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে 'আসরের মাত্র এক রাকআত পেলো সে 'আসরের সালাত পেয়ে গেলো[৬৭]। হাদীসটি প্রমাণ করে, কোনো বৈধ কারণে কেউ যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের এমন সময় সালাত আরম্ভ করে যে, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে সে মাত্র এক রাকআত সালাত পড়তে পারবে এবং সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পরে অবশিষ্ট তিন রাকআত পড়তে পারবে তার সেই সালাত জায়িয হবে।

[ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : সালাত ক্বায়িম, অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য, হা. ১৪০৩, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ); আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : সালাত, অনুচ্ছেদ : সালাতের ওয়াক্তসমূহ, হা. ১৪৯, ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান; মুসনাদ আহমাদ- ১/৩৩৩; হাকিম- ১/১৯৩; ইবনু খুযাইমাহ্- ১, ১৬৮, হা. ৩২৫।]

সারমর্ম : উপর্যুক্ত আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে গুছিয়ে সাজালে আমরা যে নির্যাস পাই, তা হলো–

১. সালাতের হুকুম পবিত্র কুরআনুল কারীমে এসেছে মোট ৮২ (বিরাশি) বার এবং ওয়াক্ত সংক্রান্ত আয়াতগুলো হলো– ৪ : ১০৩, ১১ : ১১৪, ১৭ : ৭৮, ২০ : ১৩০, ৩০ : ১৭-১৮, ৫০ : ৩৯। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২. সালাতের ওয়াক্ত বিষয়ক হাদীসে কুদসী আছে সহীহ মুসলিমে, নং ১৩৯/৮, রাবী : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)। অন্যান্য সহীহ হাদীসগুলো হলো– সালাতের সময় ও তার গুরুত্ব : বুখারী- হা. ৫২১, ৩২২১, ৪০০৭; আবূ দাউদ- হা. ৩৯৩, ৪৩০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৩, সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৪৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪০৩। সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের মর্যাদা : ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪; মুসলিম- ১/৩৬, হা. ৮৫; আহমাদ- হা. ৪২২৩।

৩. যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।[৬৮]

৪. জামা'আতের সালাতে একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব।

৫. নির্ধারিত সময় হতে দেরিতে সালাত আদায় করলে তার হক্ব নষ্ট হয়।[৬৯]

৬. ফজর ও 'আসর আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ রয়েছে। যোহরের সময় হয় সূর্য ঢলে পড়ার পর, 'আসরের ওয়াক্ত যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার সমান হয়, মাগরিব হয় সূর্য ডুবার সাথে সাথেই, 'ইশা একটু বিলম্বে, আর ফজর হয় 'গালাস'-এর মধ্যে।[৭০]

৭. ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করলে সে ব্যক্তি সারাদিন মহান আল্লাহর হিফাযতে থাকে, যোহরের ফরজের আগে চার রাকআত সুন্নাত বিশেষ ফযীলতপূর্ণ, 'আসরের ফরজের আগে চার রাকআত নফল, যে ব্যক্তির 'আসরের সালাত ফউত হলো, তার পরিবার-সম্পদ সবকিছুই যেন লুট করে নেয়া হলো। আর 'ইশার জামা'আতে উপস্থিত হতে মা নিষেধ করলেও অমান্য করার অনুমতি আছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলতে চাই যে, বিচার দিবসে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেবেন। যার সালাতের হিসাব সহজে মিলে যাবে, তার অন্যান্য হিসাবও সহজ হবে। ফর্‌য সালাতের ঘাটতি নফল থেকে পুরা করা হবে। কাজেই আমরা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই, তিনি যেন আমাদের সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাযত করার শক্তি দেন –আমীন। ❑

লেখকের অবদান : *শিরোনাম, আইডিয়া (Conceptualization), ভূমিকা, নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ (Formal analysis), উপসংহার।*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী : *কুরআন মাজীদ, কুরআন শরীফ- সরল বঙ্গা. মুহা. হাবিবুর রহমান, তাফসীর ইবনু কাসীর, তাফসীর- ড. আবূ বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া, www.hadithbd.com, কুতুবুস সিত্তাহ- বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আত্ তিরমিযী, আন্ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্।*

[৫৮] *সহীহ মুসলিম, মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[৫৯] *সহীহ মুসলিম, আবূ ক্বাতাদাহ্ থেকে ফিক্বহুস সুন্নাহ- ১/৭৯।*
[৬০] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*
[৬১] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*
[৬২] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*
[৬৩] *ফিক্বহুস সুন্নাহ- ১/৮২।*
[৬৪] *তুহফাতুল আহওয়াযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ।*
[৬৫] *সুনান আন্ নাসায়ী, সুনান আবূ দাউদ, জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৬৬] *সালাতুর রাসূল (ﷺ)- পৃ. ২৯।*
[৬৭] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৬৮] *বুখারী- হা. ৬৬২; মুসলিম- ৫/৫১, হা. ৬৬৯; আহমাদ- ১০৬১৩।*
[৬৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৯।*
[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৪৭, ৫৫৬।*

আলোকিত জীবন

প্রফেসর ড. এম এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)
ক্ষণজন্মা শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০১]

বিংশ শতকের শিক্ষাজগতে প্রফেসর এম এ বারী একটি সুপরিচিত নাম। শ্রদ্ধা, সম্মান ও সম্মোহনী প্রজ্ঞার অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়ে উঠা যেন এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। ইসলামী দর্শন ও আধুনিকতার চমৎকার সম্মিলন তাঁর জীবনের অনুপম ভূষণ। সমকালীন যামানার খানদানি পরিবারের যোগ্যতম উত্তরপুরুষ ছিলেন ড. এম এ বারী। ছাত্র ও কর্মজীবনের পরতে পরতে রয়েছে তাঁর অসামান্য নিষ্ঠা ও প্রতিভার দ্যুতি। বহমান ঘুণেধরা ইসলামী সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অনুধাবন করেছিলেন পারলৌকিক কল্যাণ লাভের পর্বতসম বাধা শির্ক ও বিদআতের দুর্লঙ্ঘ্য জঞ্জাল। তাঁর শৈক্ষিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন সদাশয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নানামুখী শিক্ষা সংস্কারের উপযুক্ত কারিগর হিসেবে তাঁকে বাছাই করা হয়। অত্যল্পকালের মধ্যে সে সকল মিশন সম্পন্নকরণ তাঁর জীবনের অসাধারণ কীর্তি। সাড়ে তিন কোটি তাওহিদী জনতার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। পূর্ববঙ্গের তাওহিদী গণমানসের ভাবনার জগতে পূর্ণতা দানে যেন নতুন চন্দ্রের উদয় হয়েছিল। রাজনীতির মতো ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। মহানবী (ﷺ)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কারণে শিয়া সম্প্রদায়ের বীজ উপ্ত হয়। ক্রমশ আরো বহুভাগে বিভক্ত হয়ে ইসলামের মৌল ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মাসআলাগত ফয়সালার সূত্র ধরে, তদীয় অনুসারীদের আগ্রহে নতুন নতুন মতবাদ সৃষ্টি হয়। সমাজে হানাফী (৬৯৯-৭৬৭), মালেকী (৭১৩-৭৯৫), শাফেয়ী (৭৬৭-৮১৯) ও হাম্বলী (৭৮০-৮৫৫) প্রভৃতি মাযহাব পরিচিতি লাভ করে। উপরিউক্ত ইমাম চতুষ্টয়ের অনুসরণ অনিবার্য জ্ঞানে স্ব স্ব মাযহাব পন্থীরা নবীর অনুসরণকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। অথচ জাতীয় জীবনকে গ্রথিত, সংহত, সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করার স্বর্গীয় রজ্জুর মহিমা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উৎকীর্ণ হয়েছে–

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا﴾

অর্থ : "তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হইও না।"[৭১]

অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১-৭৫০) পতনকাল অবধি কোনো মুসলমান নিজেকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী বা হাম্বলী বলতেন না। এ ধারা 'আব্বাসীয় খিলাফতের মধ্যভাগ (৭৫০-৮৫৫) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস ও মহান আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় অভিলাষের ফলশ্রুতিতে ইসলামের বহুধা বিভক্তি নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ ঢেউ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো অবিভক্ত বাংলাতেও আছড়ে পড়ে। শির্ক ও বিদআতের মহাপাতকে নিমজ্জিত ইসলামী সমাজ তাওহীদের চেতনাকে হারিয়ে ফেলে। তাকলিদ ও ইত্তেবার রকমফের বাংলার মুসলিম সমাজে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে অবলীলাক্রমে গড়ে উঠে অসংখ্য পীর ও তাদের মাযার। পীর ও মাযার পূজারিদের মুহুর্মুহু আনাগোনার ফলে দীপ্তিমান তাওহিদী ভাবনার আকাশে দেখা দিয়েছিল বিষণ্নতার কালো মেঘ। তাঁর জন্মের দশকে খিলাফত আন্দোলন তুঙ্গে। পলাশী (১৭৫৭), বালাকোট (১৮৩১) ও সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতিটি বাঁকে মুসলমানরা হয় লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। ওয়াহদানিয়াতের বিশুদ্ধ চর্চা করে টিকে থাকা রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ে। মুসলমানেরা ঐক্যের স্বার্থে জনপ্রিয় খিলাফতের সম্মান ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তুরস্কের অখণ্ডতা[৭২] কীভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায় সে চিন্তা ও প্রয়াসে বিভোর। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সেভার্স চুক্তি[৭৩] মুসলমানদের ভাবনার মূলে বারি সিঞ্চন করে।

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

[৭১] সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৩।

[৭২] তুরস্কের খিলাফত তখনও অক্ষুণ্ন ছিল।

[৭৩] সেভার্স চুক্তি (১০ অগাস্ট ১৯২০) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্য ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তি হিসেবে

খিলাফত আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিশ্বের মুসলমানরা যখন উৎফুল্ল-উচ্ছ্বসিত তখনই গান্ধীজী অহিংসার রেশ ধরে আন্দোলন বন্ধ করে দেন। উপরন্তু তুরস্কই এ আন্দোলনের প্রতি চরম আঘাত হানে। কামাল পাশা[৭৪]জাতীয় সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন করে প্রথমেই সালতানাত উচ্ছেদ করেন। ড. এম. এ বারী'র জন্মের মাত্র ছয় বছর পূর্বে খিলাফত উচ্ছেদ করা হয়। মুসলমানদের মনে ভীষণ আঘাত হানে। দেড় হাজার বছরের লালিত সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠান খিলাফত উচ্ছেদ হওয়ায় মুসলমানরা দীনহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির যাঁতাকলে মুসলমানরা পিষ্ট হয়ে চরম অধঃপতনে নিপতিত হয়। এমনি এক মর্মন্তুদ পরিবেশে মুহতারাম মুহাম্মদ আব্দুল বারী'র জন্ম যেন অমানিশার অন্ধকারে একঝলক চন্দ্রদর্শনের মতো হয়ে উঠে।

বগুড়ার শিবগঞ্জ থানাধীন সৈয়দপুর গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করে শিশু 'বুলু' সবারই মাঝে অজানা খুশির হিল্লোল সৃষ্টি করে। বাল্যকাল থেকেই সৌম্যদর্শন আব্দুল বারী ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছেন। বাবা আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী ছিলেন উপমহাদেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক। খিলাফত আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের বিজ্ঞ ও তুখোড় সদস্য হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

ড. এম এ বারী'র জীবনের প্রস্তুতি পর্বটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি তাঁর প্রিয় চাচাজি আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শীর একান্ত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। জ্ঞান চর্চার গহিন বারিধিতে অবগাহন করার একান্ত সুযোগ লাভ করেছিলেন তাঁর চাচাজির আগ্রহে। অকৃতদার আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরাইশী ছিলেন প্রজ্ঞাশীল বাঙালি রাজনীতিক, প্রথিতযশা সাংবাদিক ও প্রতিষ্ঠিত লেখক। ইসলাম ও সংগঠনের নিবিড় সম্পর্কের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে আব্দুল্লাহিল কাফী তাওহিদি জনতাকে সংগঠিত করেন। কুরআন সুন্নাহর আলোকে জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠা তাঁর অসামান্য কীর্তি। জ্ঞানদীপ্ত ইসলামী রাজনৈতিক পরিবারের যোগ্য উত্তরসূরি মুহাম্মদ আব্দুল বারী তাঁর দীপ্তিমান পরিবার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন।

পারিবারিক ঐতিহ্যের আবহে লালিত এম এ বারী বাল্য শিক্ষা তাঁর পিতা ও চাচার নিকট থেকে গ্রহণ করেন। ছোটকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী আব্দুল বারী পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিজ গ্রামের জুনিয়র মাদরাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর নওগাঁ কো-অপারেটিভ হাই মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সমগ্র বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে একাদশ স্থান অধিকার করে হাই মাদ্‌রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে যথা পরিসরে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ) হতে ১৯৪৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাত্র ১৯ বছর ৪ মাস বয়ঃক্রমকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ হতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫০ সালে একই বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

আরবি ভাষার ছাত্র হয়ে ইংরেজিতে পারদর্শিতার জন্য তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি নানা পুরস্কার, সম্মাননা ও বৃত্তি অর্জন করেন। নীলকান্ত গোল্ড মেডেল, বাহরুল উলুম ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী গোল্ড মেডেল অন্যতম। বিরল প্রতিভার অধিকারী ড. এম এ বারী'র জ্ঞানার্জনের অতৃপ্ত বাসনা তাঁকে সদা তাড়িত করত। ১৯৫৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এইচ এ আর গিব ও প্রফেসর জোসেফ শাখ্‌ত। একটি সূত্রমতে অবগত হওয়া যায় যে, আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন। জ্ঞান অর্জনের দুর্নিবার কৌতূহলী এম এ বারী ১৯৬১ সালে নাফিল্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ লাভ করে পূর্ব লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টোরল রিসার্চ সম্পন্ন করেন।

স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটি কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তির আওতায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের বৃহদাংশ হাতছাড়া হয়ে যায়।

[৭৪] কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) একজন তুর্কী ফিল্ড মার্শাল, বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জাতির জনক ছিলেন।

কর্মজীবনে ড. এম এ বারী ছিলেন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সততা ও নিষ্ঠা প্রবাদতুল্য। প্রবাদ প্রতীম মনীষী ড. এম এ বারী অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরে ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসে সরাসরি অধ্যাপক পদে যোগ দেন। উপযুক্ত নিয়োগকর্তার বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা সরাসরি অধ্যাপক পদে কলেজসমূহে যোগদানের ইতিহাস নেই। ইতিহাস সৃষ্টি হলো ড. আব্দুল বারী'র মেধা ও যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করে। কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি ঢাকা কলেজে এবং পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজের আরবি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। মাত্র দু'বছর পর ১৯৫৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 'রীডার' পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে একই সাথে প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন।

ড. এম এ বারী শুধু সফল শিক্ষকই ছিলেন না, তাঁর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও পরিচালনা পর্ষদের নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন, জিন্নাহ হলের (বর্তমান শের-ই-বাংলা) প্রভোস্ট ছিলেন। সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে তাঁর চৌকস ভূমিকা আজও প্রশংসিত হয়ে আসছে। মাত্র ৪০ বছর বয়সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্তি উপাচার্য নিয়োগের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য হতে তিনিই প্রথম ভিসির মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপর্যুপরি দু'মেয়াদ ভিসির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অসামান্য প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক দক্ষতার বিষয়ে সরকার প্রধান অবহিত ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ পদে দু'মেয়াদে দীর্ঘ আট বছর তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

সফল শিক্ষা প্রশাসক ও বিদ্যা বিস্তারের বিজ্ঞ ভাবুক হিসেবে তাঁর প্রতি সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লগ্নে ১৯৮৯ সালে তিনি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ লাভ করেন। মালয়েশিয়ার অনুকরণে শিক্ষা সুবিধা গ্রাম-বাংলার জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য তাঁর একক নেতৃত্বে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের ন্যায় এ দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় গড়ন প্রক্রিয়া সম্পন্নের অব্যবহিত পরে ১৯৯২ সালে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছতা ছিল প্রশ্নাতীত। বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয়িত না হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরৎ দিতেন।[৭৫]

প্রফেসর ড. এম এ বারী তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দারুণ সফলতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। একজন শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে তাঁর তুলনা হয় না। শিক্ষক হিসেবে তিনি অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত হন। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক "শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক" (Pride of Performance) নির্বাচিত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি পেশাগত ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সফল প্রকল্পক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টার দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত দু'টি কমিটিরই চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে এ সব দায়িত্ব পালন করেন।

দেশবিদেশে অনুষ্ঠিত অসংখ্য-আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে দেশ ও দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে জগদ্বাসীর নিকট তুলে ধরেন।[৭৬] প্রফেসর এম এ বারী'র অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম কমিটি ১৯৭৭, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯, মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিটি ১৯৮৯ ও জাতীয় শিক্ষা সংস্কার কমিটি ২০০২ প্রভৃতি। এ সকল কমিটির দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সাথে পালন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশ অর্থকরী কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হলেও ইসলামী ভাবধারায় ও ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রায়শ উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অভিমত, এর কারণ দ্বিবিধ, প্রথমত আধুনিক শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি না থাকা, দ্বিতীয়ত ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়

[৭৫] আলাপচারিতায় প্রাবন্ধিক একটি সূত্রে জেনেছেন যে, একবার আড়াই কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিয়েছিলেন।

[৭৬] দেশ-বিদেশের বেশ কিছু জার্নালে তাঁর লেখা প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে। সৃজনশীল লেখক ও গবেষক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে ১৭টির অধিক দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

আধুনিক শিক্ষার সংশ্লেষ না থাকা। এ অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে মুসলমানদের জন্য আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একটি একক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ করতে হবে, তেমনি ইসলামী শিক্ষাকে করতে হবে আধুনিক জীবনের চাহিদার উপযোগী। আর এজন্য ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন সম্ভব। এ উপলক্ষ্যে ১৯৩৮ হতে ১৯৪৯ সাল অবধি অন্তত তিনটি কমিটি কাজ করেছে।[৭৭] কিন্তু সুপারিশ প্রণয়ন ছাড়া তেমন কিছুই হয়নি। পরে ১৯৭৬ সালের ১লা ডিসেম্বর বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘোষণাক্রমে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে কমিটি গঠিত হয়। সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. এম এ বারী।

প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধানে বন্ধুর পথ মাড়িয়ে পরিগৃহীত সুপারিশমালার আলোকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হয়। ইসলাম বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের আধুনিক জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিষয়াদির সমন্বয় সাধন করে গ্রাজুয়েট তৈরি করার সুপারিশমালা প্রণীত হয়। একাধিক অনুষদ ছাড়া কতিপয় ইনস্টিটিউট সম্পর্কে পরিগৃহীত সুপারিশমালা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য বহন করে। ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল রিসার্চ এবং 'আব্বাসীয় ও স্পেনীয় উমাইয়া আমলের বায়তুল হিকমা ও কর্ডোভার দারুল হিকমার আদলে ব্যুরো অব ট্রান্সলেশন ও মধ্যপ্রাচ্য শিক্ষা ইনস্টিটিউট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ড. আল্লামা আব্দুল বারীর মেধা প্রাখর্যের ফলস্বরূপ অতীত গৌরবোজ্জ্বল ধারাকে অনুসরণ করে ইসলামী তাহজীব তমদ্দুন সমুন্নত রাখার জন্য এ সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। কমিটির সুপারিশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি ল্যাবরেটরি স্কুল কাম মাদ্‌রাসা স্থাপন করার কথা উল্লেখ করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে পাঠদান করা হবে। মাত্র সাত মাসের রিপোর্টে অভিভূত তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ন ছিল, "আজকের নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সময় ইসলামের নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে জ্ঞান আদান-প্রদানের ও নবদিগন্তে ছায়া বিনিময়ের সেতুবন্ধনের কাজ করবে। যুগোপযোগী এ সুপারিশমালা অতিদ্রুত বাস্তবায়িত হবে।"

প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় নানা কারণে দেশে সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি না থাকার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে ক্রমাগত শিক্ষার মান কমতে থাকে। এ সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে গঠিত হয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ। ড. এম এ বারী উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। সুপারিশমালায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্‌রাসা, বৃত্তিমূলক, কারিগরি, শিল্পভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক, ব্যবসায় ও বাণিজ্যিকভিত্তিক, ললিতকলাভিত্তিক, চিকিৎসাভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ড. এম এ বারী'র অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিটির সুপারিশ প্রণয়ন। ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরের বিষয়সমূহকে ঢেলে সাজানো হয়। মান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির চমৎকারিত্ব সুপারিশমালার উল্লেখযোগ্য দিক। কমিটির সুপারিশমালার অন্যতম দিক ছিল শিক্ষক প্রশিক্ষণ। দীর্ঘ মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ ও সজ্জীবনী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের কর্মউদ্যোগকে শানিত করার অভিনব পদ্ধতি পরিগৃহীত হয়। কমিটি মাদ্‌রাসা কামিল উত্তীর্ণ যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা যথা এমফিল, এম এস ও পি এইচ ডিসহ মৌলিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশমালায় মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয়ের প্রয়াস ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সুপারিশসমূহ আজও অনুমোদন লাভ করেনি।

২০০২ সালে ড. এম এ বারী'র নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত সে জাতি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং তাহযীব-তমুদ্দুনের দিক দিয়েও ততোধিক উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। এ নীতির আলোকে গঠিত কমিটি কাজ শুরু করে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তিনি সুপারিশমালা পেশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেগুলোর বাস্তবায়ন আজও হয়ে উঠেনি। মোটা দাগে নিদেনপক্ষে ৪টি শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক কমিটির দায়িত্ব লাভ একটি ব্যক্তির জীবনে দুর্লভ সম্মান বলা যায়। তিনি সকল কমিটির রিপোর্ট যথাসময়ে উপস্থাপন করে সমকালীন পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও সরকারের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও তাঁর বিষয়ে সম্যক্ অবগত ছিলেন। *[চলবে]*

[৭৭] ২৪ ১৯৩৮-৪১ খ্রিষ্টাব্দের মাওলা বখশ কমিটি, ১৯৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন কমিটি ও ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মাওলানা আকরাম খাঁন কমিটি।

ক্বাসাসুল কুরআন

রাসূল (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিল

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

৪০ বছর বয়স হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা ও পরিপক্বতার বয়স। নবীরা এই বয়সেই ওহি লাভ করে থাকেন। রাসূল (ﷺ)-এর বয়স ৪০ হওয়ার পর তাঁর জীবনের দিগন্তে নবুওয়াতের নিদর্শন চমকাতে লাগল। এই নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন সে স্বপ্ন শুভ্র সকালের মতো প্রকাশ পেত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বত গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশের একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

পুরো রামাযান রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সত্তার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোন পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন।[৭৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যে আত্মার নসীবে নবুওয়াতরূপী এক মহান আসমানী নিয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিকপথ নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চাইতে মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল-আমানতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাশ্বত আদর্শের আঙ্গিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখন নবুওয়াত প্রদানের প্রাককালে তাঁর জন্য একমাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।[৭৯]

ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ওহী এসেছিল রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। চান্দ্র মাসের হিসাব মোতাবেক সে সময় মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর ছয় মাস ১২ দিন।

নবী (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনাটি বর্ণনা করেছে তার স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর প্রথম প্রথম নিদ্রাবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা সকালের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পূর্বে একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকদিন 'ইবাদত বন্দেগী করা। এজন্য তিনি কিছু খাদ্য-

---

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৭৮] *রহমাতুল্লিল 'আলামীন- আল্লামা সুলায়মান মানসুরপুরী, ১/৪৭ পৃ.; সীরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৩৫-২৩৬ পৃ.; ফী যিলালিল কুরআন- সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ২৯/১৬৬ পৃ.।*

[৭৯] *ফী যিলালিল কুরআন- ২৯/১৬৬-১৬৭।*

সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে আসলে তিনি পুনরায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছল। ফেরেশ্‌তা (জিবরাঈল) তাঁর নিকট এসে বললেন, আপনি পাঠ করুন। রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি পাঠ করতে জানি না। রাসূল (ﷺ) বলেন, তখন ফেরেশ্‌তা [জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)] আমাকে ধরে খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট উপলব্ধি করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পাঠ করুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে জানি না। এতে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন। আর আমি খুবই ভয় পেলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন! আমি বললাম, আমি তো পাঠ করতে জানি না। তখন তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বারের মতো খুব শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

﴿اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

“আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পাঠ করুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন; তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে, আপনি পাঠ করুন আর জেনে নিন, আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানী ও দাতা, যিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন; আর মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা মানুষ জানত না।”[৮০]

এরপর রাসূল (ﷺ) এ অবস্থায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। তখন সবাই তাঁকে বস্ত্রাবৃত করেছিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডেকে বললেন, শুনো, আমার কি হলো! আমি আমার নিজের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছি। তারপর তিনি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে সব কথা খুলে বললেন। একথা শুনে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, কখনো নয় আপনি বরং শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে কখনো অসম্মান করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার অধিকার আদায় করেন। সদা সত্য কথা বলেন। অসহায়দের কষ্টভাব লাঘব করেন। গরীবদের অর্থ উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং ভালো কাজে সাহায্য করেন। তারপর খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ﷺ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকাহ্ জাহিলী যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ধর্মীয় কিতাব লিখতেন। এমনকি ইঞ্জিল কিতাব অনুবাদ করে অনেক কিছু লিখেছিলেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, ভাই! আপনার ভাতিজা কি বলেন, একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকাহ্ নবী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে ভাতিজা! কি ব্যাপার তুমি কি দেখতে পাও? তখন নবী (ﷺ) যা কিছু দেখেছিলেন সব খুলে বললেন। নবী (ﷺ)-এর মুখে সবকিছু শুনে ওয়ারাকাহ্ বললেন : “ইনিই সে ফেরেশ্‌তা যাঁকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল।” আহা! যদি আমি সে সময় যুবক হতাম, হায়! আমি যদি বেঁচে থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তারা কি আমাকে এখান থেকে বের করে দিবে? ওয়ারাকাহ্ বললেন, হ্যাঁ! তারা তোমাকে বের করে দিবে। তুমি যা পেয়েছ, তা যে-ই পেয়েছে, তাকেই দুঃখ দেয়া হয়েছে। তোমার সে সময় আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফাল মারা যায় এবং ওহী দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুবই চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন।[৮১]

এই ঘটনার পর সাময়িকভাবে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাসূল (ﷺ) খুবই চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি অস্থির হয়ে মক্কার পাহাড়, উপত্যকায় ঘুরতে থাকেন। মনে কোনো প্রশান্তি পাচ্ছিলেন না। প্রভু তার কাছ থেকে কি চান? এ সময়ে মাঝেমাঝে গায়েব থেকে আওয়াজ আসতো, নিঃসন্দেহে আপনি সত্য রাসূল। তখন তিনি মনে প্রশান্তি অনুভব করতেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের আয়াত নাযিল করলেন।

﴿يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَاَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

“হে চাদর আবৃত ব্যক্তি, উঠুন এবং মানুষকে সতর্ক করুন। আর আপনার প্রভুর বড়ত্ব প্রকাশ করুন।”[৮২]

এরপর থেকে ওহী ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত নবীজির নিকট আসতে থাকে। ❑

[৮০] *সূরা আল ‘আলাক্ব : ১-৫।*

[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩।*

[৮২] *সূরা আল মুদ্দাস্‌সির : ১-৩।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

হজ্জে অজ্ঞতাবশত ভুল-ত্রুটি

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : সম্মানিত পাঠক! আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর হজ্জব্রত পালনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে যায় বায়তুল্লাহয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে, জান্নাত পাবার আশায়, যেহেতু আল্লাহ সমর্থবানদের জন্য হজ্জকে ফর্‌য করেছেন, রাসূল (ﷺ) বলেন–

«اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

অর্থাৎ- কবুল হজ্জের বিনিময় হলো জান্নাত।[৮৩]

তাই আমরা যারা হজ্জ করতে যাচ্ছি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এত অর্থ, শ্রম ব্যয় করে হজ্জে যাচ্ছি তাই সম্ভাব্য চেষ্টা করতে হবে যেন এতে কোন ভুল-ত্রুটি না হয়। আমরা বিভিন্নভাবে হজ্জের নিয়ম-কানুন হয়ত বা জানি, তার পরেও অনেকে স্বাভাবিকভাবেই অতি সাধারণ মনে করে কিছু ভুল করেই বসেন। তাই আমাদের সতর্ক হওয়া জরুরি যেন আমরা যথাযথ হজ্জ সম্পন্ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হই। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করা হলো।

ক. মীকাত ও ইহরাম সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি :

১. হজ্জ কিংবা ‘উমরাহ্‌র নিয়ত থাকা সত্ত্বেও ইহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করা।

২. ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর থেকে ইযতিবা করা ও তাওয়াফ শেষে ইযতিবা অবস্থাতেই দু’রাকআত সালাত আদায় করা। ইযতিবা অর্থ চাদরের দু’প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর রেখে দিয়ে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা। ইযতিবা করাতে হয় তাওয়াফ করার সময়।

৩. ‘উমরার নিয়তের সময় لبيك عمرة ও হজ্জের নিয়তের لبيك حجا বলা ছাড়া অন্য কোনো শব্দে নিয়ত পাঠ করা।

খ. তালবিয়া পাঠ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি : অনেকে দলবদ্ধভাবে একই স্বরে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। পূর্বে একজন বলেন পরে সবাই সমস্বরে বলেন। এরূপ করা ভুল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাগণ এভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তেন। তবে যদি কেউ না জানে শিক্ষার জন্য অন্যের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

গুরুত্ব দিয়ে তালবিয়া মুখস্থ করতে হবে ও বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে।

গ. হারামে প্রবেশের সময় ভুল-ত্রুটি :

১. পবিত্র হারামে প্রবেশের সময় অনেক হাজী এমন কিছু দু‘আ পাঠ করে থাকেন যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। অথচ সংগত হলো মাসনূন দু‘আ পাঠ করা।

২. মাসজিদুল হারামের নির্দিষ্ট একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ জরুরি মনে করা; বরং যে কোনো দরজা দিয়েই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা সঙ্গত।

ঘ. তাওয়াফের সময় ভুল-ত্রুটি :

১. তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ কোনো দু‘আ নির্দিষ্ট করা ও তা পড়া।

২. তাওয়াফের সময় একজন নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চস্বরে দু‘আ পড়া ও অন্যরা সমস্বরে তার অনুকরণ করা।

৩. অনেকেই মনে করেন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন না করলে হজ্জ শুদ্ধ হবে না, এ ধারণা ঠিক নয়; বরং সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন-স্পর্শ করা সুন্নত। পক্ষান্তরে সম্ভব না হলে কেবল ইশারা করাই সুন্নত।

৪. কেউ কেউ রুকনে ইয়ামেনিকে চুম্বন করে থাকে। এটা ঠিক নয়; বরং সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ডান হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামেনিকে স্পর্শ করা ও স্পর্শের পর হাতে চুম্বন না করা। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে, এ ক্ষেত্রে হাতে ইশারা করার কোনো বিধান নেই।

৫. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ কাবার দেয়াল স্পর্শ করেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনি ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করেননি। তাই তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ হাতীমের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে থাকেন। এরূপ করলে তাওয়াফ হবে না। কেননা হাতীম পবিত্র কাবার অংশ হিসেবে বিবেচিত।

[৮৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৭৩।*

৭. অনেকেই তাওয়াফের সময় সাত চক্করেই রামল করেন, এরূপ করা উচিত নয়। নিয়ম হলো– কেবল প্রথম তিন চক্করে রামল করা, আর বাকি চক্করগুলোতে স্বাভাবিকভাবে চলা। উল্লেখ্য যে, রামল অর্থ- দ্রুত চলা।

৮. তাওয়াফের সময় অনেকেই মাকামে ইব্রাহীমকে হাত অথবা রুমাল-টুপি দিয়ে স্পর্শ করে থাকে, এরূপ করা মারাত্মক ভুল।

৯. বিদায়ী তাওয়াফের পর পবিত্র কাবার সম্মানার্থে উল্টো হেঁটে বের হওয়া সংগত নয়; বরং স্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসতে হবে।

১০. অনেকের ধারণা–মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে ছাড়া মাসজিদের অন্য কোথাও তাওয়াফের দু'রাকআত সালাত আদায় করা যাবে না। এ ধারণাও সঠিক নয়; বরং সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমে সালাত আদায় করবে সম্ভব না হলে হারামের যে কোন স্থানে পড়ে নিবে।

সা'ঈ করার সময় ভুল-ত্রুটি :

১. সা'ঈর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে পড়া; বরং মনে মনে নিয়ত করতে হবে।

২. মারওয়া পাহাড় থেকে সা'ঈ শুরু করা; বরং সাফা পাহাড় থেকে সা'ঈ শুরু করতে হবে।

৩. সাফা পাহাড়ে উঠে সালাতের তাকবিরের ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে ইশারা করা। শুদ্ধ হলো দু'হাত তুলে শুধু দু'আ করা।

৪. কেউ কেউ মনে করেন, সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে সা'ঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়। এ ধারণা ভুল; বরং সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলেই এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

৫. সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত সা'ঈ করার পুরো সময়টাতে দ্রুত চলা ভুল। সা'ঈর সময় কেবল সবুজ দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলতে হবে।

৬. কেউ কেউ সা'ঈ করার সময়ও ইযতিবা করে থাকে। এটা ভুল। ইযতিবা কেবল তাওয়াফে কুদুমের সময় করতে হয়।

৭. পুরুষদের জন্য সবুজ চিহ্নের মাঝে সা'ঈ তথা দৌড়ে না চলা; বরং দৌড়ে চলতে হবে।

৮. সা'ঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা দু'আ পাঠ করা; বরং প্রতি চক্কর শেষেই চাহিদামতো দু'আ করবে।

ঙ. হলক কিংবা কসরের সময় ভুল-ত্রুটি :

১. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা পরিব্যাপ্ত না করা। কেউ কেউ একাধিক 'উমরাহ্ আদায়ের লক্ষ্যে এরূপ করে থাকে যা সুন্নাতের খিলাফ ও ভুল। কারণ একটি সফরে একাধিক 'উমরাহ্ করা ঠিক নয়।

২. সা'ঈর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে হলক-কসর করা। অথচ নিয়ম হলো ইহরামের কাপড় গায়ে থাকা অবস্থায় হলক-কসর করা।

চ. ৮ যিলহজ্জ-এ ভুল-ত্রুটি :

১. ৮ তারিখে মিনাতে না এসে সরাসরি আরাফায় চলে যাওয়া।

২. পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ না করা।

৩. মিনাতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মিনার বাইরে অবস্থান করা।

ছ. আরাফা দিবসের ভুল-ত্রুটি :

১. আরাফার সীমানায় প্রবেশ না করেই উকুফ করা এবং সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া।

২. আরাফা মনে করে মাসজিদে নামিরার সম্মুখভাগে উকুফ করা। অথচ এ অংশটি আরাফার সীমানার বাইরে।

৩. জাবালে আরাফাকে জাবালে রহমত বলা তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় মনে করা এবং সেখান থেকে বরকতের আশায় পাথর সংগ্রহ করা।

৪. কিবলাকে পেছনে রেখে জাবালে আরাফার দিকে মুখ করে দু'আ করা।

৫. সূর্যাস্তের পূর্বেই মুযদালিফার উদ্দেশে আরাফাহ থেকে বের হয়ে যাওয়া।

জ. উকুফে মুযদালিফার ভুল-ত্রুটি :

১. ধীর-স্থির ও শান্ত ভাব বজায় না রেখে হুলস্থুল করে মুযদালিফার পথে রওয়ানা হওয়া।

২. মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে পথেই মাগরিব-'ইশা আদায় করে নেয়া।

৩. সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্র-আযকারের মাধ্যমে মুযদালিফায় রাত্রি-যাপন করা।

৪. মুযদালিফায় উকুফ না করে তা অতিক্রম করে মিনায় চলে যাওয়া।

৫. সূর্যোদয় কিংবা তারও পর পর্যন্ত মুযদালিফার উকুফকে প্রলম্বিত করা। কেননা রাসূল (ﷺ) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন।

ঝ. কঙ্কর নিক্ষেপের ভুল-ত্রুটি : মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়িয়ে না নিলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা। জামরাতে শয়তান রয়েছে মনে করে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় উত্তেজিত হয়ে নিক্ষেপ করা। স্তম্ভের গায়ে কঙ্কর না লাগলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা; বরং হাউজের মধ্যে যেকোন জায়গায় পড়লেই কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে। মুস্তাহাব মনে করে কঙ্কর ধুয়ে পরিষ্কার করা। নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভিড়ের ভয়ে অন্যকে দিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো। ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে কঙ্কর মারা। প্রতি জামারাতে ৭টির বেশি কঙ্কর মারা এবং প্রতিদিন দুই কিংবা তিনবার করে কঙ্কর মারা। প্রথম ও মধ্যম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দু'আ করার জন্য না দাঁড়ানো। ৭টি কঙ্কর একবার মুষ্টিবদ্ধ করে নিক্ষেপ করা।

অন্যান্য ভুল-ত্রুটি : আইয়ামে তাশরীকে মিনায় অবস্থান না করা।

১. হারাম সীমানার বাইরে 'হাদী' জবেহ করা। কুরবানির জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাই না করে কুরবানি করা।

২. কুরবানি করার পর নিজে না খেয়ে এবং ফকির-মিসকিনকে না দিয়ে ফেলে দেয়া। ঈদের দিনের আগে কুরবানি করা।

৩. কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ শেষ করার পূর্বেই বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করা এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করে সরাসরি নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া। বিদায়ী তাওয়াফের পর যাত্রার ব্যস্ততা ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা। বিদায়ি তাওয়াফের পর কাবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানানো। কিংবা কাবাকে সামনে রেখে উল্টো হেঁটে মসজিদ থেকে বের হওয়া।

মদীনাহ্ মুনাওয়ারা যিয়ারতকালে ভুল-ত্রুটি :

১. মদীনাহ্ যিয়ারত হজ্জের অংশ বলে মনে করা।

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতকালে কবরের চারপাশের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলো স্পর্শ করা, চুম্বন করা এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জানালায় সূতা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।

৩. অভাব পূরণের জন্য কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর কাছে দু'আ করা। কোনো কিছুর জন্য দু'আ কেবল মহান আল্লাহর কাছেই করার বিধান রয়েছে।

৪. মাসজিদে নাববীর ভিতর রাসূল (ﷺ)-এর মিহরাব ও 'উসমানী মিহরাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করা ও একে বরকতময় মনে করা।

৫. মাসজিদে নাববীর দেয়াল, রাসূল (ﷺ)-এর মিহরাব ও মিম্বার বরকতের উদ্দেশে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা।

৬. উহূদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া এবং বরকত লাভের আশায় ছেঁড়া কাপড় বা নেকরা বাঁধা এবং সেখানে এমন-সব কাজ করা যাতে মহান আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি নেই।

৭. এ ধারণা পোষণ করে কিছু স্থানের যিয়ারত করা যে, এগুলো রাসূল (ﷺ)-এর নিদর্শন। যেমন- উষ্ট্রীর বসার স্থান, আংটি কূপ [যে কূপে রাসূল (ﷺ)-এর আংটি পড়ে গিয়েছিল] অথবা 'উসমান (আলাইহিস সালাম)-এর কূপ। অথবা বরকত লাভের আশায় এ সব স্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা।

৮. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে দু'আ পাঠ করা এবং এ ধারণা করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতে থাকা যে, এ স্থান দু'আ কবুলের বিশেষ স্থান। মাসজিদে নাববীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাকআত সালাত আদায় ওয়াজিব মনে করা। বাকি কবরস্থান ও উহূদের শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং কল্যাণ-বরকত লাভের আশায় সেখানে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

সাত মাসজিদ নামক স্থানে গিয়ে ফযীলাত লাভের উদ্দেশে প্রত্যেকটি মাসজিদে দু'রাকআত করে সালাত আদায় করা। মদীনায় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মদীনায় জুতা পরিধান করা উচিত নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নির্ভুলভাবে হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন –আমীন। ❑

বিস্ময়-বৈচিত্র্য

জিহ্বা : হৃদয়ের দরজা

–মো. হারুনুর রশিদ*

জিহ্বাকে আরবিতে 'লিসান' বলা হয়। এটি একটি মাংসপিণ্ড। জ্ঞানীরা জিহ্বাকে 'হৃদয়ের দরজা' নামে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের অন্তরের গোপনীয়তা জিহ্বা দ্বারাই প্রকাশ পায়। এর ক্ষমতা প্রবল ক্ষমতাশালী নরপতি হতেও বেশি। জিহ্বা হচ্ছে মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের একটি। আল্লাহ তা'আলা জিহ্বাকে বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা ও মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ○ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾

"আমি কি তার জন্য দু'টি চোখ বানাইনি? আর একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট!"[৮৪]

জিহ্বা বা মুখের ব্যবহার থেকেই বুঝে নেয়া যায়, কোন ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান অথবা নির্বোধ? কে কতটা সভ্য অথবা অসভ্য? এই জিহ্বার অযাচিত ব্যবহারের ফলেই অনেককে হতে হয় বিপন্ন অথবা লাঞ্ছিত। এই জিহ্বার অপব্যবহারের কারণেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অনেক মানব সন্তানকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ এই জিহ্বা। এটি মাংসল অঙ্গ, যা মুখের ভিতর অবস্থিত। জিহ্বার গোড়াকে বলে শিকড়। এই শিকড় গলার ভিতরের অঙ্গের সংযুক্তি। থাইরয়েড নামক হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। চোয়ালের হাড়ের সঙ্গেও রয়েছে এ অঙ্গের সংযুক্তি।

জিহ্বার রহস্য ও আধুনিক বিজ্ঞান : রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভারে গঠিত এই জিহ্বা। পাকস্থলীর প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ একে বলা চলে। দ্রব্য মুখে পুরবার পরই আরম্ভ হয় এই জিহ্বার স্বাদ। এটা নরম আঠালো এবং পিচ্ছিল সংকোচন ও প্রসারণ বিশিষ্ট। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই ঘোরান ফিরান যায়। এর রাসায়নিক ক্রিয়াই সবচাইতে অদ্ভুত এবং সৃষ্টি রহস্যকারী। মনে হয় হাজার রকম 'ফিল্টার' এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিটি জিনিস জিহ্বায় দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে চোখ বুঁজেই বলা যায় এবং ভাগ করা যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমরা ল্যাবরেটরীতে এক পদার্থ হতে অন্য পদার্থ কে পৃথক করে থাকি। সেখানে H2S, H2SO4, NH3NO4, NH4SO4, HCI, NH3 ইত্যাদি Chemical Agent হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। জিহ্বাকে বিশ্লেষণ করে উক্ত সাহায্যকারী Agentগুলো দেখতে পাই না, তবে এটা হতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যা খাদ্যকে নরম, পিচ্ছিল ও ভজন উপযোগী করে পাকস্থলিতে পাঠায়। আর এই নিঃসৃত রস উক্ত Chemical Agent হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

জিহ্বাকে ডাক্তারি মতে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় কতকগুলো মাংস স্তর একটার উপর আর একটা মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ জিহ্বার রূপ নিয়েছে। এর উপরিভাগ ছিদ্র ছিদ্র। আশ্চর্য এইখানে যে খাবার উপযোগী পদার্থগুলোই এটা গ্রহণ করে আর বাকিগুলো অন্য কোনো অঙ্গের পরামর্শ না নিয়েই ফিরিয়ে দেয়। যেমন- পচা দুর্গন্ধময়, বিষজাতীয় দ্রব্য, বিষাক্ত পদার্থ এতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ ফেলে দেয়। আর উপযোগী খাদ্য পেলে যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলী পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যপ্রণালী আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সম্ভব হয় না। জিহ্বাকে কেটে তুলে ফেলে আমাদের তৈরি নতুন জিহ্বা স্থাপন করা চলে না। অথবা এর পরিবর্তে অন্য কোনো 'ফিল্টার' বসিয়েও কোনো খাদ্যদ্রব্যকে পৃথক করে দেখা যায় না। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জিহ্বা গঠিত, সেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়েও আমরা নতুন জিহ্বা তৈরি করতে পারি না অথবা এর অনুরূপ সৃষ্টি করে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই।

জিব্বার ছাপের মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ : আমরা কি কখনো আমাদের জিহ্বা নিয়ে আশ্চর্যবোধ করেছি? এটা আল্লাহ পাকের এক অতীব বিস্ময়কর সুন্দর সৃষ্টি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে একটাই জিহ্বা দান করেছেন। কিন্তু এই একটা মাত্র জিহ্বা দিয়ে আমরা হাজার রকম খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। যদি আমাদের জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকত? তাহলে আমরা একটা আম আর একটা মাটির চাকের মধ্যে কোনো তফাৎ ধরতে পারতাম না।

আমরা জানি, আমাদের হাতের আঙ্গুঁলের যে ছাপ তা এক-এক মানুষের এক-এক রকম। কারো ছাপের সাথে কারো ছাপের মিল নেই। এটি আমরা অনেকেই জানি। হাতের আঙ্গুলের মতো আমাদের জিহ্বার ছাপও কিন্তু এক-এক জনের এক-এক রকম।

আল্লাহ পাক আমাদের শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী এই অঙ্গটি দান করেছেন তাঁর প্রশংসা গাওয়ার জন্য।

---

* *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর;* ***মেম্বার :*** *Qur'an Research Foundation।*

[৮৪] *সূরা আল বালাদ : ৮-৯।*

সত্যিকারভাবে এই জিহ্বার সাহায্যেই আমরা মহিমাময় কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি, মহান আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্ব নিয়ে কথা বলতে পারি। মিথ্যা কথা বলা, গিবত, পরনিন্দা, পরচর্চা এসব খারাপ কাজে জিহ্বাকে দূষিত করার জন্য আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেননি।

জিহ্বা ও আধুনিক বিজ্ঞান : জিহ্বা মানুষের মুখ গহ্বরের সম্মুখভাগে বিদ্যমান, যাতে ক্ষতিকর জিনিস মাত্রকেই সে সঙ্গে সঙ্গে উগলে ফেলে দিতে পারে। কোন জিনিস তিক্ত না মিষ্টি, ঠান্ডা না গরম, টক না লোনা, কোমল না কটু, তা মানুষ এই যন্ত্রের দ্বারাই টের পায়। মানুষের জিহ্বায় রুচিবোধের জন্য ৯ হাজার সেল কোষ, যার প্রতিটি সেল একাধিক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ প্রতিটি বস্তুর স্বাদ ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুভব করতে পারে। যেমন- আপেল, কমলা, আম প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ আমরা বুঝতে পারি। চিকেন, মাটন, বীফ প্রত্যেকটি মাংস জাতীয় খাদ্য কিন্তু এদের আলাদা আলাদা স্বাদ পরখ করা যায়। জিহ্বার মধ্যে আস্বাদন স্তর না থাকলে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ এক রকম মনে হতো।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে– আমরা জিহবা দিয়ে যখন কথা বলি, তখন জিহ্বার ১ লক্ষ ১৬০০ হাজার সেল একত্রে এসে এমনভাবে আমাদের কথাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়, যাতে কোনো কথার সাথে কোনো কথার সংঘাত না হয়। এখন প্রশ্ন– কোন সে মহাকারিগর যিনি এই বিস্ময়কর পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, শুধু তাই নয়, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর দেহে এই সেলগুলো তৈরি করেননি।

জিহ্বার লালা ও আধুনিক বিজ্ঞান : মুখের ভেতর আল্লাহ তা'আলা অতি প্রয়োজনীয় এক প্রকারের তরল লালা সৃষ্টি করেছেন। যা খাদ্যের সাথে মিশে হজম ক্রিয়ায় সহায়তা করে। আহারের সময় এই লালা আবশ্যক পরিমাণে নির্গত হয় এবং খাবারের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এটি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও সুনিপুণ কৌশলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ যদি না হতো এবং সর্বদা এই লালা নির্গত হতে থাকত তবে মুখ খোলাই সমস্যা হয়ে পড়ত। আর কথা-বার্তা বলা তো আরো কঠিন হয়ে পড়ত। কারণ মুখ খুললেই বা কথা বলতে গেলেই লালা গড়িয়ে পড়ত এবং বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হত। আল্লাহ পাক অপার অনুগ্রহে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, এই লালা শুধু খাদ্য চিবানারে সময় নির্গত হয় এবং পরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে অন্য সব সময় মুখে লালা সীমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, যাতে মুখ ও কণ্ঠনালী সিক্ত থাকে। নতুবা কণ্ঠনালী শুকিয়ে যেত এবং কথা বলা অসম্ভব হয়ে পড়ত। এমনকি কণ্ঠনালী শুকিয়ে শ্বাস গ্রহণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ত। যার ফলে অনিবার্যভাবে প্রাণনাশ ঘটত।

জিহ্বার স্বাদ : জিহ্বা এবং স্বাদ, জিহ্বা নাকের মতো একইভাবে কাজ করে। এটি তার পৃষ্ঠের পেপিলি নামক দোলগুলোতে অবস্থিত ক্ষুদ্র স্বাদের কুঁড়ি ব্যবহার করে খাবার এবং পানীয়গুলোতে ফ্লেভারেন্ট (Flavorants) নামক পদার্থ শনাক্ত করে। স্বাদ গ্রহণের জন্য স্বাদ কুঁড়ি নাকের ঘ্রাণযুক্ত প্যাঁচগুলোর অনুরূপভাবে কাজ করে। তারা মস্তিষ্কের গস্টেটরি (Gustatory) সেন্টারে স্নায়ু সংকেত পাঠায় যা আপনি কী স্বাদে স্বাদ গ্রহণ করছেন তা কার্যকর করে। আপনার স্বাদ এবং গন্ধের সংবেদনগুলো এক সাথে কাজ করে ফ্লেভারটি নির্ধারণ করে। যদি আপনার ঠান্ডা লেগে থাকে যা আপনার নাক আটকে দিয়েছে, আপনি খেয়াল করতে পারেন যে খাবারটির স্বাদ কম বলে মনে হচ্ছে, এর একই স্বাদ, তবে কম গন্ধ এবং এত কম সামগ্রিক স্বাদ।

জিহ্বার, শক্ত স্বাদ : আপনি বিভিন্ন স্বাদ বুঝতে পারেন। এগুলোকে সাধারণত পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়– মিষ্টি, নুন, টক, তেতো এবং মজাদার (ইয়ামি বলা হয়), তবে মরিচের মতো মশলাদার স্বাদসহ আরও কিছু থাকতে পারে। মরিচ এমন একটি রাসায়নিক উৎপাদন করে যা জিহ্বাকে জ্বালায়।

Reference: *Book: Human Body Encyclopedia. (P: 177), Author: Stave Parker, Consultant: Dr Sue Maan. U.K (London)*

জিহ্বার স্বাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান : স্বাদ অর্থে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের crudest, আমাদের অন্য কোনো জ্ঞানের চেয়ে বিশ্ব সম্পর্কে কম তথ্য দেয়। স্বাদ খাবারে নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক দ্বারা উদ্দীপিত হয় যা আপনার মুখের লালাতে দ্রবীভূত হয় এবং তারপরে জিহ্বায় সংবেদনশীল স্নায়ু কোষের মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশে তথ্য প্রেরণ করে। স্বাদ কুঁড়িগুলো আপনার জিহ্বার পৃষ্ঠের পেপিলি নামক ক্ষুদ্রাকৃতির কাছাকাছি পাওয়া রিসেপটর কোষ। একটি পাঁচটি স্বীকৃত স্বাদ বর্তমানে আছে। উম্মি বা রসালো, পাশাপাশি মিষ্টি, নোনতা, তেতো এবং টক। জিহ্বার পেছনে একটি বৃহৎ বৃত্তাকার পেপিল থাকে যা একটি উল্টা-ডাউন ভি এর মতো হয়, গভীর ফাটলে স্বাদের কুঁড়ি থাকে। জিহ্বার সামনের অংশটি যেখানে ছত্রাকজনিত (মাশরুমের মতো) পেপিলি এবং ফিলিফর্ম (চুলের মতো) পেপিলি পাওয়া যায়। স্বাদের পাশাপাশি জিহ্বাও খাবারের গঠন এবং তাপমাত্রা অনুভব করতে পারে। খাবারের স্বাদকে আরও আকর্ষণীয়

করে তুলতে আপনার স্বাদ অনুভূতি আপনার গন্ধ অনুভূতির সাথে একত্রে কাজ করে। মশলাদার খাবারের মতো শক্ত স্বাদগুলো জিহ্বায় ব্যথা-সংবেদনশীল নার্ভের শেষের চেয়ে গন্ধের বোধের উপর কম নির্ভর করে। চা-বা ওয়াইন-টেস্টারদের ক্ষেত্রে লোকেরা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি স্বাদ এবং স্বাদ আলাদা করতে শিখতে পারে।

Reference: *Book: "Encyclopedia Of Body", Miles Kelly. U.K (London).*

জিহ্বার ভাষা তৈরীর রহস্য : পৃথিবীতে মানুষের মতো করে আর কোনো প্রাণী নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে কথা বলা শিখিয়েছেন। কুরআন মাজিদে আছে–

﴿خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ﴾

"তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন (বাকশক্তি দান করেছেন)।"[৮৫]

পাকস্থলীর অঙ্গ হিসেবে কাজ করা ছাড়া জিহ্বার আর একটা প্রধান এবং প্রয়োজনীয় কাজ আমরা দেখতে পাই।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু মনের ইচ্ছাকে এই শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে কথায় সৃষ্টি করতে পারি না। যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করি সেটাতে ভাব ও আবেগের প্রকাশ হয় না। বাংলা ভাষা এতে নেই বা হলো ইংরেজি, ফরাসি, ল্যাটিন প্রভৃতি সেরা ভাষাগুলোরও কোনো সৃষ্টি এতে দেখা যায় না। কিন্তু মহান আল্লাহর সৃষ্টি এই জিহ্বা গলার সুরকে নিয়ে ইচ্ছামতো মনের আবেগ ও ভাবকে প্রকাশ করে। তালুর সঙ্গে এক ধাক্কা দেয়, দাঁতের সঙ্গে এক ধাক্কা দেয়। আবার প্রয়োজনে এক ধাক্কা দিয়ে নাকের ভেতরও কিছু শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে সুন্দর, সুললিত ভাষায় বের করে। অদ্ভুত এর কারুকার্য, অদ্ভুত এর কার্যপ্রণালী। ইংরেজি, ফরাসি, উর্দু, দেবনাগরীর ব্যবধান এতে নেই। যে কোনো ভাষায় ইচ্ছার প্রকাশ করার মতো ব্যবহার এই জিহ্বা জানে।

কোন সে কারিগর, যিনি জিহ্বাকে দিয়ে শব্দতরঙ্গ আলোড়ন এনে কথা সৃষ্টি করেন? কোন সে রসায়নবিদ, যিনি সর্বদা জিহ্বাকে আর্দ্র রাখেন যার ফলে কথা নষ্ট হয় না? কোন সে আদেশ দাতা যার বদৌলতে তা সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে উচ্চ ও নিম্ন স্বরে কথা সৃষ্টি করেন? তিনিই আল্লাহ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ সন্নিবেশিত করেছেন।

আমাদের স্বরযন্ত্রে যে কথা তৈরি হয় তাতে জিহ্বা অংশগ্রহণ করে থাকে। জিহ্বা না থাকলে প্রয়োজনীয় কথা তৈরি করে তার ডেলিভারি দেওয়া মোটেও সম্ভব হতো না। আর আমাদের ঠোঁট দু'টো কথা বলার সময় সঞ্চালিত হয়। খাদ্য ও পানীয় সর্বপ্রথম রিসিভ করে ঠোঁট। পরে মুখের ভেতর আবদ্ধ করে উপযোগীতা সৃষ্টি করে। মানুষের ঠোঁটদ্বয় দাঁতের উপর আবৃত্ত থাকে, যার দরুন চেহারার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

যত বিপদ ডেকে আনে জিহ্বা : মানুষকে ধ্বংসের অতলে ডুবাতে পারে, আবার সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। অধিকাংশ পাপ ও পুণ্যের কাজ জিহ্বা দ্বারাই সংঘটিত হয়। সুতরাং জিহ্বাকে সংযত রাখাই আবশ্যক। গীবত, মিথ্যা, কুটনামি, পরনিন্দা, অশ্লীল কথা ও গালমন্দ ইত্যাদি এই জিহ্বারই কাজ। তাই বলা হয়, যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিলানো অপেক্ষা জিহ্বাকে সংযত রাখা অধিক কঠিন কাজ। এ ব্যাপারে 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। "তোমার ঘরকে প্রশস্ত করো। ঘরকে প্রশস্ত করার অর্থ মেহমানদারি করো। তোমার অপরাধের জন্যে কান্নাকাটি করো।"[৮৬]

এছাড়া সুফিয়ান ইবনু 'আব্দুল্লাহ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আমি আরজ করলাম–

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য যে জিনিসগুলো ভয়ের কারণ বলে আপনি মনে করেন, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ংকর কোনটি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটা (অর্থাৎ- জিহ্বা)।[৮৭]

এই হাদীস হতে বুঝা যায়, জিহ্বা কত ভয়াবহ। তা কন্ট্রোল করা বা সংযত করা বড়ই কঠিন। এ ব্যাপারে আসলাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি নিজের জিহ্বা টানছিলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, থামুন! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুক। ব্যাপার কি? তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করেছে।[৮৮]

সুতরাং জিহ্বার অসংযত ব্যবহারের কারণেই আজ স্বামী-স্ত্রীতে, মানুষে-মানুষে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অশান্তি বিরাজ করছে। এজন্যই আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহ্বা বা বাকশক্তি)-এর এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস

[৮৫] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৩-৪।*

[৮৬] *জামে' আত্ তিরমিযী।*

[৮৭] *জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*

[৮৮] *মু'আত্তা মালেক, মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*

(লজ্জাস্থান)-এর নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তার জন্য বেহেশ্‌তের জামিন হতে পারি।[৮৯]

উল্লিখিত হাদীসে দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু দ্বারা জিহ্বা, মুখ আর দুই পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু দ্বারা লজ্জাস্থানকে বুঝানো হয়েছে। মূলত এই দুই অঙ্গ দ্বারা অধিকাংশ কবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়। আর যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় না, তার জন্যে জান্নাতে প্রবেশে কোনো বাধা থাকবে না। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বলেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে-ই সর্বোত্তম মুসলিম।[৯০]

মানুষের সাথে একজন মুসলিম কীভাবে কথা বলবেন, সে বিষয়ে ইসলাম কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করে দিয়েছে। সর্বাবস্থায় মুসলিমকে অটুট বিশ্বাস নিয়ে মনে রাখতে হবে যে, তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি যদি উত্তম কিছু বলেন, তিনি পুরস্কৃত হবেন। আর যদি মন্দ কিছু বলেন, তবে সেই মন্দ কথার জন্যে তাকে অবধারিতভাবেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার সাথেই রয়েছে।"[৯১]

রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মুখের কথা খুবই বিপজ্জনক। একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, বান্দা অনেক সময় এমন কথা বলে, যাতে সে গুরুত্ব দেয় না অথচ সেই কথা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ফলে আল্লাহ এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা অনেক সময় এমন কথাও বলে, যাতে সে গুরুত্ব দেয় না অথচ সেই কথা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। ফলে সেই কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।[৯২]

কাজেই মুখের কথা বিপদের কারণ হতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থেকে আমাদেরকে কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্যেই রাসূল (ﷺ) আরও বলেছেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; অন্যথায় চুপ থাকে।"[৯৩]

ঈমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহু আনহু) বলেন, হাদীসটির বক্তব্য এ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে স্পষ্ট যে, কোনো কথায় উপকার ও কল্যাণ নিহিত না থাকলে তা না বলাই কর্তব্য। তবে যে কথা বললে উপকার ও কল্যাণ হয়, তা বলাই কর্তব্য। কিন্তু যদি কল্যাণের দিকটা সন্দেহ পূর্ণ হয়, তবে কথা না বলাই উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾

"এবং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"[৯৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরে কুরতুবা ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে, যে বিষয় তোমার জানা নেই, তা কাজে পরিণত করো না। জানাশুনা ছাড়াই কাউকে দোষারোপ করো না। কারণ, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে। কানকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারাজীবন কী কী শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারাজীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারাজীবন কী কী কল্পনা করেছ এবং কী কী বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরিয়তবিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারো গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরিয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে। কিংবা অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে, অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এসব প্রশ্নের ফলে কিয়ামতের দিন আজাব ভোগ করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে বলেন, বান্দা যখন ভালো-মন্দ বিচার না করে কোনো কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায়, যা পূর্বে ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।[৯৫]

আমাকে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এই আমানতের হিফাযত করতে হবে। মহান আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে তাঁর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। তাতেই হবে নিয়ামতের শুকরিয়া, আমানতের হিফাযত। আমার এ চোখ দিয়ে আমি এমন কিছু দেখব না, যা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। হাত দিয়ে এমন কিছু ধরব না, যা ধরতে তিনি নিষেধ করেছেন। এমন পথে পা বাড়াব না, যে

[৮৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৯০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৯১] *সূরা ক্বা-ফ : ১৮।*
[৯২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৫।*
[৯৩] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*
[৯৪] *সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৬।*
[৯৫] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম।*

পথ শয়তানের। আমার জবান দিয়ে এমন কথা বলব না, যা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মোটকথা, আমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে ভালো কাজ করব, খারাপ থেকে বিরত থাকব। কারণ, আমার এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাল সাক্ষী হবে। ভালো কাজ করলে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আর মন্দ কাজ করলে আমারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। সে এক কঠিন পরিস্থিতি! বান্দা মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান। হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। একমাত্র চেষ্টা, কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে। বান্দা চেষ্টা করবে পাপ অস্বীকার করতে। এমনি সময় আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিবেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী দেয়ার। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে কথা বলার শক্তি দেবেন। সেগুলো কথা বলবে। আমাদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদের সব গোপন বিষয় বলে দেবে। সব সত্য বলে দেবে। আমরা অস্বীকার করতে পারব না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জবানে মোহর মেরে দেবেন। আমরা কিছু বলতে পারব না, অস্বীকারও করতে পারব না। কথা বলবে শুধু আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যেমন- কুরআনে এসেছে–

﴿ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।"[৯৬]

শুধু কি তা-ই! আমার শরীরের চামড়াও সাক্ষ্য দেবে আমার বিরুদ্ধে, যদি আমি তা আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করি। যে চামড়া আমার চেহারাকে সুন্দর করেছে, তা যদি আমি মহান আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করি, হারাম ক্ষেত্রে রূপের প্রদর্শন করি, তাহলে তা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। সে বলবে, দুনিয়াতে তুমি আমাকে আমার রবের নাফরমানিতে ব্যবহার করেছ। সেদিন আমি কিছু বলতে পারিনি। আজ আমার রব আমাকে বলার শক্তি দিয়েছেন। আমি আজ সব বলে দেব। তখন মানুষ নিজের শরীরের চামড়াকে বলবে–

﴿وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا﴾

"তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?" সেগুলো উত্তর দিবে–

﴿أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ﴾

"ঐ আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে।"[৯৭]

হ্যাঁ, এখনই আমাকে ভাবতে হবে; আমার অবস্থা কেমন হবে। আল্লাহর দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি আমি মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করছি, না তাঁর নাফরমানিতে? তা কি কিয়ামতের ঐ কঠিন মুহূর্তে মহান আল্লাহর সামনে, সকল সৃষ্টিজীবের সামনে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, না বিপক্ষে।

"আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা-সরল থাকো, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন করো, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।"[৯৮]

মূলকথা হলো– কথাবার্তা বলতে জবানের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, একটা অসত্য কথার কারণে, মুখের একটা খারাফ কথা উচ্চারণের কারণে স্বামী-স্ত্রীতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে হতাশা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর একটি সত্য ও ভালো কথার কারণে স্বামী-স্ত্রীতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি বিরাজ করে।

জিহ্বা সম্পর্কে অজানা তথ্য :

১. জিহ্বা মানবদেহের সবচেয়ে নমনীয় মাংসপেশি। **২.** জিহ্বাই একমাত্র মাংসপেশি যেটি মানবদেহের এক প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। **৩.** জিহ্বায় ৮ টি মাংসপেশি আছে। **৪.** জিহ্বার ওপরিপৃষ্ঠকে 'ডরসাম' বলা হয়। **৫.** আঙুলের ছাপের মতো প্রত্যেক মানুষের জিহ্বার ছাপও আলাদা আলাদা রকমের হয়। জিহ্বায় ১০,০০০ স্বাদ কোরক আছে। **৬.** নাক বন্ধ থাকলে অনেক সময় জিহ্বায় খাদ্যের স্বাদ অনুভব করা যায় না। মানুষ জিহ্বা দিয়ে প্রায় ৮,০০০ রকমের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। **৭.** ঝাল কোনো স্বাদ নয়। স্বাদ কোরকগুলো যখন ব্যথা পায় তখন সেটিকে মস্তিষ্ক ঝাল হিসেবে বিবেচনা করে। **৮.** জিহ্বা দিয়ে নিজ হাতের কনুই স্পর্শ করা সম্ভব নয়। **৯.** জিহ্বা দিয়ে নাকের ডগা স্পর্শ করা যায়, তবে সেটি খুব কঠিন কাজ। **১০.** জিহ্বার নড়াচড়ায় লালা নিঃসরণ বাড়ে। **১১.** মানুষের জিহ্বা থেকে প্রতিদিন ২ থেকে ৩ পাইট লালা নিঃসৃত হয়। **১২.** জিহ্বার লালা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং হজমে সাহায্য করে। ❑

[৯৬] *সূরা ইয়া-সীন : ৬৫।*

[৯৭] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ২১।*

[৯৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪০৭; মুসনাদ আহমদ- হা. ১১৪৯৮।*

মুসলিম মহিলাদের জন্য উত্তম আদর্শ

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

সম্মানীত মুসলিম রমণীবৃন্দ! একটা বিষয় মনে রাখতে হবে আপনারা কিন্তু কখনও আমাদের প্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর অত্যন্ত আদরের কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে উত্তম নন। তাঁকে তাঁর আব্বাজান একদা বলেছিলেন– "হে ফাতিমাহ্! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো, দুনিয়াতে আমার নিকট যা চাওয়ার চেয়ে নাও, মনে রেখ আখিরাতে আমি তোমাকে মহান আল্লাহর বিচার হতে কোনো প্রকার রক্ষা করতে পারবো না।" তাই প্রত্যেকে নিজে নিজে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে জাহান্নামের সেই কঠিন আগুন হতে বাঁচার জন্য। কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট– যেখানে রাসূল (ﷺ) তাঁর কলিজার টুকরা মেয়ে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কোনো প্রকার উপকার করতে পারবেন না সেখানে আমাদের মতো পুরুষ হোক আর মহিলা হোক কারো নিকট হতে উপকারের আশা করা নিতান্তই বোকামীর পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব 'আমল অনুযায়ী বাঁচা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

তাছাড়া আরো একটি ভয়ঙ্কর বিষয় বিশেষ করে মুসলিম রমণীদের জন্য, সেটি হচ্ছে রাসূল (ﷺ)-কে মিরাজের রাতে স্বচক্ষে জাহান্নাম দেখানো হয়েছিল। তিনি দেখেছেন যে, জাহান্নামের অধিবাসীরা অধিকাংশই মহিলা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (ﷺ) বলেন, তারা বড্ড অকৃতজ্ঞ বিশেষ করে তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। সারা বছর তাদের সাথে ভালো আচরণ করে ও কোনো দিন সামান্য কিছুর অভাব হলেই বলে, আমি তোমার কাছে কোনো দিন সুখ পাইনি।[৯৯]

সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন– দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান। মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান। কারণ বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ফিতনা দেখা দিয়েছিল তার কারণ ছিল স্ত্রীলোক।

অনুরূপ পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾

অর্থ : "গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের (মহিলাদের) চক্রান্ত; তোমাদের চক্রান্ত ভীষণ কঠিন।"[১০০]

আশ্চর্যের বিষয় এ ধরনের চক্রান্তকারী মহিলাদের মধ্যে স্বয়ং দু'জন নবীর স্ত্রীরও বর্ণনা ইবনু কাসীর-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যেমন নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী লোকদের বলে বেড়াতো যে, আমার স্বামী নূহ্ (আলাইহিস সালাম) একজন পাগল। আর লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী নিজ বাড়িতে আগত মেহমানদের ব্যাপারে তার জাতিকে অবগত করিয়ে দিত যাতে তারা তাদের সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এর কেউ কেউ বলেছেন এরা উভয়েই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি করে বেড়াতো। সুতরাং আমরা যত বড় নেককার হই না কেন এবং যত বড় নেককার লোকদের নেতৃত্বাধীন থাকি না কেন ঈমান না আসলে কোনো বাহাদুরি কাজে আসবে না কিন্তু।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মু'মিন মহিলাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ও মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে। অবশ্য এ ব্যাপারে

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৯৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৯০৭।*
[১০০] *সূরা ইউসুফ : ২৮।*

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন জমিনে চারটি দাগ টানলেন এবং বললেন, “তোমরা কি জানো এটা কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালো জানেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, জান্নাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা হলেন– (১) খাদিজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ, (২) ফাতিমাহ্ বিনতু মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), (৩) মারইয়াম বিনতু ‘ইমরান এবং (৪) আসিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী)।”[১০১]

অতএব সম্মানীত মুসলিম রমণীগণ! যদি আপনারা সুন্দর চরিত্র গঠনে উৎসাহী হন তবে তা অর্জনের জন্য নিম্নে কয়েকজন আদর্শ রমণীর উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে পেশ করা হলো।

(১) মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) : মায়ের নাম হান্নাহ বিনতে ফাকুজ। পিতার নাম ‘ইমরান। হান্নাহ ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি একদিন বাগানে দেখলেন এক মা পাখী ঠোঁটে করে খাদ্য ও পানি এনে তার বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে তার অন্তরে বাচ্চা পাওয়ার খুব বাসনা জাগল। অতঃপর তিনি আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের নিকট বললেন, “হে আমার রব! তুমি আমাকে একটি সন্তান দাও, তবে আমি তাঁকে তোমার ঘরের (বাইতুল মুকাদ্দাস)-এর খাদেম (সেবক) বানাব। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করেন এবং ঐ রাতেই তিনি গর্ভবতী হন এবং গর্ভে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-কে ধারণ করলেন। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসল এবং এক কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। ফলে তার মনে খুব অনুতপ্ত হলো এবং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের সমীপে বললেন,

﴿رَبِّ إِنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾

অর্থাৎ- “হে আমার রব! আমি যে এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আল্লাহই ভালো জানেন সে কি প্রসব করেছে, পুরুষ কি কখনও মেয়ের মতো হতে পারে।”[১০২]

তিনি তার নাম রাখলেন মারইয়াম যার অর্থ আল্লাহ তা‘আলার খাদেমা ও তাঁর ঘরের হিফাযতকারিণী। তারপর বললেন,

﴿وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ﴾

অর্থাৎ- “হে আমার রব! আমি তাকে এবং তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[১০৩]

হে মু’মিনাগণ! দেখুন, মারইয়াম-এর মায়ের দু‘আ আল্লাহ কবুল করে তার কন্যা মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) এবং নাতি ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে শয়তানের হাত হতে কত সুন্দরভাবে হিফাযত করলেন। যার জন্য তারা দু’জন জীবনে কোনো পাপ কাজে জড়ায়নি। কারণ হান্না শুধু মাত্র মহান আল্লাহকে বলেছিলেন তার সন্তানের হিফাযতের জন্য আর কাউকে নয়। অথচ আজকের সদ্যপ্রসূত বাচ্চার মাথার নিকট লোহা রেখে, অথবা কোনো হাড্ডি রেখে, অথবা কোনো তাবীজ গলায় ঝুলিয়ে সন্তানের হিফাযত কামনা করে। সুতরাং মানত করতে হবে এক মহান আল্লাহর জন্য এবং সর্বপ্রকার হিফাযত কামনা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট অন্য কারোর নিকট নয়।

(২) সা-রাহ [ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী] : যখন সারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে মিশরের অত্যাচারী বাদশার নিকট নেওয়া হয় তাঁর ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য, সেই কঠিনতম মুহূর্তে বিবি সারাহ ওযূ করে নামায পড়ে মহান রাব্বুল ‘আলামীনের নিকট বলেন– “হে আল্লাহ! যদি তুমি সত্যই জেনে থাকো আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার রাসূলের উপরও ঈমান এনেছি এবং নিজের ইজ্জতকে স্বামী ছাড়া অন্যদের নিকট হতে হিফাযত করেছি, তবে এই কাফির যেন আমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।” এ কথা বলামাত্র ঐ কাফির

[১০১] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৬৬৮, সনদ সহীহ।*

[১০২] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৬।*

[১০৩] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৬।*

বাদশা কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ঠিক একই অবস্থা এই কাফির বাদশার তিন চারবার হওয়াতে রাগত স্বরে বলেন : তোমরা আমার নিকট এ শয়তানীকে প্রেরণ করেছ! শিগগিরই তাকে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ফেরত দাও এবং হাজেরাকেও উপহার স্বরূপ দিয়ে দাও। অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ফেরত নেওয়া হলো তখন তিনি তাকে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে ধরে বললেন : তুমি কি বুঝতে পারনি আল্লাহ তা'আলা কাফিরের ফন্দি বানচাল করেছেন এবং দাসীকে সাহায্য করেছেন।

সম্মানীত মু'মিনা রমণীগণ! লক্ষ্য করুন, কিভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বিবি সারাহকে ঐ অত্যাচারী বাদশার হাত থেকে তার সতীত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনা এবং মুসিবতের সময় দু'রাকআত সালাত আদায়ের মাধ্যম ছাড়া আর কিছু নয়। এ কথার মধ্যে কিন্তু এমন কথা নেই যে, অমুকের ওয়াসীলায়, অমুকের সম্মানে এ বিপদ হতে উদ্ধার করো। শুধুমাত্র মহান আল্লাহকেই সকল প্রকার বিপদের ওয়াসীলা বানাতে হবে অন্য কারোর নয়।

(৩) উম্মুল মু'মিনীন খাদিজাহ্ বিনতু খুয়াইলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) : যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর হেরা পর্বতে প্রথম ওহী নাযিল হয়, তখন তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হন বিবি খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি তাঁর (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আনেন এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই বলেন কখনও না, আল্লাহর কসম, তিনি কখনও আপনাকে অসম্মানিত করবেন না। কারণ (১) আপনি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, (২) দুস্থদের সাহায্য করেন, (৩) মিসকিনদের খাদ্য জোগান, মেহমানদের খাদ্য খাওয়ান এবং মানুষের হক্ব কার্জে সাহায্য করেন।

হে মু'মিনা রমণীগণ! ভালো এবং সৎ ব্যক্তি কখনও ধ্বংসের মুখে পতিত হয় না। তাছাড়া স্বামীর প্রতি তাঁর কি পরিমাণ ভক্তি, ভালোবাসা এবং বিশ্বাস এটি কি অনুকরণযোগ্য নয়? অবশ্যই অবশ্যই এগুলো অনুসরণ করতে হবে।

(৪) হাজেরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) : ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাতা সারাহ ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন বিবি হাজেরাকে এবং তার দুধের বাচ্চা শিশু ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে মক্কাতে মহান আল্লাহর ঘরের নিকটে নির্জন মরুভূমির প্রান্তরে রেখে ফিলিস্তিনের দিকে রওনা হচ্ছিলেন তখন হাজেরা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে বার বার প্রশ্ন করছিলেন আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, তবে আপনি চলে যান, নিশ্চয়ই তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।

এই ঘটনা বিবি হাজেরার আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ। তাদের কি আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন কখনও না; বরং তাদের ওয়াসীলায় আজ মক্কা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নগরীতে পরিণত হয়েছে। এভাবে কেউ সত্যিকারভাবে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেই।

(৫) ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা : ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন উত্তম সবরকারিণী এবং মহান লজ্জার অধিকারিণী। যিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অত্যান্ত আদরের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজে হাতে রুটি বানানোর জন্য যাঁতা পিষতে পিষতে হাতে দাগ বানিয়ে ফেলেছিলেন। রশিযুক্ত পানির পাত্র দ্বারা নিজেই পানি আনতেন, আর চুলা জ্বালাতে জ্বালাতে কাপড় চোপড় কালো মলিন করে ফেলতেন।

অন্যদিকে একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু সংখ্যক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন : উত্তম মহিলা কে? তারা বুঝে উঠতে পারছিলেন না এর কি জবাব দেবেন। তখন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘরে যেয়ে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, হায়! যদি তাকে বলতেন, উত্তম মহিলা হচ্ছে তারাই যারা পুরুষদের দেখেনি এবং পুরুষরাও তাদের দেখেনি।

তখন তিনি ফেরত এসে রাসূল (ﷺ)-কে এই উত্তর দিলেন। উত্তরটি রাসূল (ﷺ) শুনে বললেন, তোমাকে কে এই উত্তরটি শিখিয়ে দিয়েছে? উত্তরে জামাতা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তখন রাসূল (ﷺ) খুশি হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই সে আমারই অংশ।

হে মুসলিম রমণীগণ! দেখুন, স্বয়ং বিশ্বনবী (ﷺ)-এর অত্যন্ত আদরের কন্যা এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে রুটি বানাতে যাঁতা পিষত, পানি আনত, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করত, চুলা জ্বালাত, খাদ্য প্রস্তুত করত, বাচ্চাদের প্রতিপালন করত। কখনও স্বামীর সাথে জোরে কথা বলত না, রাগ করত না, কখনও কোনো বিষয়ে জেদ করত না। এর মধ্যে রয়েছে সবরের সর্বোত্তম উদাহরণ। আপনারা কি ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে অনুসরণ করে সবরকারীনি হতে চেষ্টা করবেন না?

অন্য ঘটনায় লজ্জার যে সুন্দর উদাহরণ তিনি দিয়েছেন এটি ভাব্বার বিষয়। তিনি বললেন : সর্বোত্তম মহিলা হচ্ছেন তাঁরাই যাদের পুরুষরা দেখে না, আর পুরুষদেরও তারা দেখে না। এর থেকে অধিক লজ্জাশীলা আর কে হতে পারে যা ফাতিমাহ্তুজ যোহরা তাঁর পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। ভালো মেয়েরা সর্বদা পুরুষদের থেকে দূরে থাকে। আর পুরুষরাও তাদের থেকে দূরে থাকে। (যাতে পর্দা লঙ্ঘন না হয়) এই ঘটনার সাথে আজ কালকার যামানার মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সম্পূর্ণ উল্টো। যে কারণে বর্তমান মেয়েরা বেশি ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে। তাই আপনাদেরকে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মতো সহ্যশীল ও লজ্জাবতী হতে হবে।

(৬) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "সমস্ত মহিলাদের মধ্যে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মর্যাদা ঐরূপ, যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারিদ' (গোশ্ত রুটির পলান্ন)া সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।"[১০৪]

অন্যদিকে নবুওয়াতের বদনাম করার জন্য এবং নবী (ﷺ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মুনাফিকরা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নামে মিথ্যা কলঙ্কের কালিমা লেপন করলে স্বয়ং মহান রাব্বুল 'আলামীনই সূরা আন্ নূর-এর ১১-২০ নং পর্যন্ত পর পর ১০(দশ)টি আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর সতীত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। সচ্চরিত্রবান হলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এভাবেই মানুষকে সম্মানিত করেন।

পরিশেষে সকল মুসলিম রমণীদেরকে উপরোক্ত আদর্শ রমণীদের আদর্শ গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবস্থান করুক এ কামনাই করি। আল্লাহ তা'আলা সহায় হোন –আমীন। ❑

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" (শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃঃ, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিঃ) বলেন :

«إذا صح الحديث فهو مذهبي».

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ! সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।" **(ইবনু আ'বিদান- আল বাহর আর রায়িক-এর হাশিয়ায়- ১/৩৬ পৃঃ এবং রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃঃ, শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৬২ পৃঃ)**

[১০৪] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৫২।*

কবিতা

তুমি কেমন মুসলমান?

মুহাম্মদ আব্দুল হাই

ভাইকে তোমার মারছে যখন, ধরছো এমন ভান
নিজের মায়ায় ব্যস্ত তুমি, বাঁচাইতে নিজের প্রাণ
তুমি কেমন মুসলমান? তুমি কেমন মুসলমান?

পাপাচারে ডুবল জাতি, সেদিকে তোমার নজর নেই,
শত্রুরা আজ বুকের উপর, তবুও তোমার খবর নেই।
ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাত আজও কি হবে না অবসান,
তুমি কেমন মুসলমান? তুমি কেমন মুসলমান?

সুদ, ঘুষ আর যেনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতার শেষ নেই,
ধন-জন আর নারীর নেশায় ধ্বংস করছ জীবনটাই,
চোখটা বুঁজে সইছো সবি, নষ্ট করছো সতেজ ঈমান
তুমি কেমন মুসলমান? তুমি কেমন মুসলমান?

ধর্ম নিয়েও করছো দেখ, হাজার রকম টালবাহানা,
মসজিদ-মাদ্‌রাসা ছেড়ে দিয়ে, মাজারেতে আড্ডাখানা।
চোখটা মেলে দেখলে না তুমি, সত্যের আহ্বান,
তুমি কেমন মুসলমান? তুমি কেমন মুসলমান?

খুলে দাও মনের বাঁধন

মো. গিয়াস উদ্দিন

হে আল্লাহ! খুলে দাও মোর মনের বাঁধন,
তোমার যিক্‌র করি, দিবানিশি সারাক্ষণ।
আমাকে দাও গো তোমার সকল রহমত,
যা দিয়ে দূর করো নেক বান্দার মুসিবত।

হে প্রভু! সর্বোত্তম জিনিস মোরে করো দান,
আমার দু'আ কবুল করো, তুমি শক্তিমান।
ঈমানের সাথে বাঁচাও, আমি মুসলমান,
উত্তম মৃত্যু তোমার হাতে, তুমি যে রহমান।

পাপী-তাপীকে দাও শাস্তি অন্তরে দাও ভয়,
অনৈক্য দাও তাদের মাঝে দাও পরাজয়,
মু'মিনকে দাও সুখ শান্তি সকল বিজয়,
মুশরিককে দাও নিকৃষ্ট শাস্তি পরাজয়।

কাফির মুশরিক মানবতার দুশমন,
প্রভু! তাদের উপর করো গজব বর্ষণ,
তারা মানে না হাদীস কুরআনের শাসন,
বিশ্বাস করে না নবী রাসূলের সুবচন।

হিদায়াতের পথে তারা করে বাধা বন্ধন,
আল্লাহ প্রদত্ত সীমানা করে তারা লঙ্ঘন,
হে আল্লাহ! তাদের পাগুলো করো কম্পমান,
তুমি মহান; তব ভয়ে পালায় শয়তান।

সবখানে ভেজাল

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

আদায় ভেজাল ধাঁধায় ভেজাল
ভেজাল এখন অয়েলে,
চালে ভেজাল ডালে ভেজাল
ভেজাল মশার কয়েলে!
একটার পর একটা জ্বালাই
আছে যত দামি,
গাইছে মশা কানের ধারে
হয় না কোনো কামই!

ফুলে ভেজাল কুলে ভেজাল
ভেজাল ডাবের পানিতে,
কেশেও ভেজাল দেশেও ভেজাল
ভেজাল রাজা-রানিতে!
জনে ভেজাল মনে ভেজাল
ভেজাল ভালোবাসাতে,
ভাঙতে ভেজাল গড়তে ভেজাল
ভেজাল স্বপ্ন আশাতে!

আঁখি মেলে যেদিকে চাই
শুধু ভেজাল দেখি,
দেখতে আসল মনে হলেও
আসলে সব মেকী!
খুঁজলে তবে সঠিক পাবে
ভেজাল ভরা মহীতে
সাচ্চা খাঁটি পাবেই পাবে
আল্লাহ তা'আলার ওহীতে।

মাদক

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম

তামাক-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট ও মাদকদ্রব্য
সেবন করা নাজায়িয-হারাম জীবন হবে নষ্ট,
ফেনসিডিল আর হিরোইনসহ সকল মাদকদ্রব্য
সেবনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও হোক কষ্ট।
বর্তমান বিশ্বে শতকরা ৯৫ জন পুরুষ মানুষ
মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে নেই তাদের হুঁশ,
হও সচেতন, হও সাবধান কর পরিহার মাদক
দ্বীনের পথে চলো অবিরাম জীবন হবে স্বার্থক।
তামাক-জর্দা বিড়ি-সিগারেট কর সবাই পরিহার
জীবন তোমার বিফল হবে ভেবেছো কি একবার?
মাদক সেবন করলে পরে হবে অনেক রোগ
ক্যান্সার, ব্লাড ক্যান্সার, ফুসফুসে পানি জমা, জন্ডিস,
মস্তিষ্ক বিকৃত, যক্ষ্মাসহ বহু রোগ করো তা প্রতিরোধ।
করুন পরিহার মাদকদ্রব্য, হোক সুস্থ জীবন
পরকালে মুক্তি পাবে এই সুন্দর জীবন।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

মাইক্রোওয়েভ ওভেনের রান্না স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর?

প্রযুক্তিগত উন্নতি যত হচ্ছে আমরা ততই এক ধাপ করে এগিয়ে চলেছি। যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে, তথ্য জানার ক্ষেত্রে, এমনকি রান্না পর্যন্ত নিমেষেই হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের জীবন সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠেছে। সেইরকমই, মাইক্রোওয়েভ ওভেন আসার পর থেকে প্রত্যেকের জীবনকেই সহজ করে তুলেছে, কারণ, প্রচলিত রান্নার পদ্ধতির তুলনায় এটি চটজলদি খাবার রান্না করা বা খাবার গরম করতে সাহায্য করে।

তবে, মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার রান্না করা নিরাপদ কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা দিক তুলে ধরেছেন।

আসুন এই বিষয়ে আমরা জেনে নিই। কীভাবে মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম হয়? হার্ভার্ড হেলথের মতে, মাইক্রোওয়েভের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে পানির কণাগুলো খুব দ্রুত দিক পরিবর্তন করে এবং পানির কণাগুলো কাঁপতে থাকে। ফলে, কণাগুলোর ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়, যা খাবারের ভেতরে থাকা তরল অংশ গরম হয়ে যায়। এভাবে একসময় পুরো খাবারটিই গরম হয় এবং রান্না করতে সাহায্য করে। তবে, যেসব খাবারে পানি কম থাকে সেগুলো তুলনামূলকভাবে কম গরম হয়।

রান্নার জন্য মাইক্রোওয়েভ কী নিরাপদ?

খাবার মাইক্রোওয়েভে রান্না করা হোক বা নিয়মিত গ্যাস ওভেনে, খাবারে ভিটামিন সি জাতীয় পুষ্টিগুণ যখন তাপের সংস্পর্শে আসে তখন তা ভেঙে যায়। আর, মাইক্রোওয়েভে রান্না হতে খুব কম সময় লাগে বলে পুষ্টি উপাদান ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকে।

তবে, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড কেমিস্ট্রি জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় জানা গেছে, মাইক্রোওয়েভে একবার গরম করা হলে দুধ ও কাঁচা গরুর গোশতের মতো কিছু খাবারে থাকা ভিটামিন বি ১২-এর প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়।

ইউ. এস. ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, মাইক্রোওয়েভ রান্নায় যদি কোনো প্লাস্টিক কন্টেইনার ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটি ক্ষতিকারক, কারণ উত্তাপের ফলে সেটি গলে যেতে পারে।

এছাড়াও, প্লাস্টিকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দূষক বি পি এ বা বিসফেনল এ রয়েছে, প্লাস্টিকের পণ্যগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ইস্ট্রোজেন জাতীয় যৌগ।

অবশ্য, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে, মাইক্রোওয়েভে রান্না করা খাবার অন্যান্য প্রচলিত ওভেনে তৈরি করা খাবারের মতোই নিরাপদ। তবে, এই দুই ওভেনের মধ্যে মূল একমাত্র পার্থক্য হলো মাইক্রোওয়েভে খুব কম সময়ে খাবার রান্না বা গরম হয়। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এর কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ এখন পর্যন্ত নেই। *[সূত্র : (বোল্ডস্কাই) অন্য এক দিগন্ত]*

উচ্চ রক্তচাপ : ওষুধ ছাড়াই নিরাময়

কয়েক দশক ধরেই বিশ্বজুড়ে অন্যতম ঘাতক ব্যাধি-উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন), যা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি জটিলতাসহ জীবনঘাতী নানা রোগের সূত্রপাত করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি তিনজনে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ সংখ্যা প্রতি পাঁচজনে একজন।

রক্তচাপ : আমাদের দেহে ছড়িয়ে আছে জালিকার মতো অসংখ্য রক্তনালী। শিরা ধমনী মিলিয়ে যার দৈর্ঘ্য ৬০ হাজার মাইল। রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় এই সকল রক্তনালীর গায়ে যে চাপ পড়ে, তা-ই রক্তচাপ। এই চাপ নির্ভর করে হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা এবং রক্তনালীর প্রতিরোধের ওপর।

রক্তচাপ মাপার পূর্বে করণীয় : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চা-কফি না খাওয়া, ধূমপান না করা, হেঁটে বা দৌড়ে না আসা, মাপার সময় কথা না বলা, ২ মিনিট ব্যবধানে দুই হাতে দুই বার রক্তচাপ মাপা। এছাড়া ভরাপেটে বা খাওয়ার পর না মাপা।

যদি কখনো কারো প্রথম চেক-আপে রক্তচাপ বেশি পাওয়া যায়, তবে তা আসলেই উচ্চ রক্তচাপ কিনা, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে বিভিন্ন সময়ে তিন বার (সম্ভব হলে ছয়বার) রক্তচাপ মেপে দেখতে হবে। যদি রক্তচাপ প্রতিবারই বেশি থাকে, তবে তা নিশ্চিতই উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ : অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ রোগী অনুভব করে না। চেক-আপ বা অন্য রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে। তবে যে-সব উপসর্গ হতে পারে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথা, কাঁধব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, ক্লান্তি বোধ, অবসন্নতা, অতিরিক্ত ঘাম, অনিদ্রা, দমের সমস্যা, চোখ-মুখ অতিরিক্ত জ্বালাপোড়া করা।

উচ্চ রক্তচাপের ধরন : উচ্চ রক্তচাপ মূলত দুই প্রকার। ⇨ প্রাইমারি হাইপারটেনশন (৯৫%) এটি সরাসরি জীবনাচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ⇨ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন (৫%) অন্য কোনো রোগের কারণে এটি হয়ে থাকে।

প্রাইমারি হাইপারটেনশনের কারণ : ⇨ স্থূলতা, ⇨ টাইপ-২ ডায়াবেটিস, ⇨ অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ খাবার গ্রহণ, ⇨ তৈলাক্ত-চর্বিযুক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার গ্রহণ, ⇨ রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ (চিনি, সাদা চাল, সাদা ময়দা), ⇨ রান্নায় অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার এবং লবণযুক্ত অন্যান্য খাবার গ্রহণ, ⇨ খাবারে পটাশিয়ামের ঘাটতি, ⇨ ভিটামিনের ঘাটতি, ⇨ ফাইটোকেমিক্যালের ঘাটতি, ⇨ ধূমপান, ⇨ অতিরিক্ত মদ্যপান, ⇨ ক্রমাগত মানসিক চাপ বা স্ট্রেস, ⇨ নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ সেবন।

উচ্চ রক্তচাপের ক্ষতিকর প্রভাব : হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা তিন গুণ বেড়ে যায়। হার্ট ফেইলিউরের ঝুঁকি বাড়ে চার গুণ। স্ট্রোকের ঝুঁকি সাত গুণ বেড়ে যায়। আলঝেইমার্স ডিজিজ ও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ধমনীর ভেতর-দেয়ালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সেখানে চর্বি জমতে সাহায্য করে (অ্যাথেরোস্কে-রোসিস)। উচ্চ রক্তচাপ ক্রনিক কিডনি ডিজিজেরও কারণ।

প্রাইমারি হাইপারটেনশনের প্রচলিত চিকিৎসা এবং সীমাবদ্ধতা : প্রাইমারি হাইপারটেনশন একটি লাইফস্টাইল ডিজিজ হলেও বিশ্বব্যাপী যে চিকিৎসা দেয়া হয়, তা মূলত ড্রাগ থেরাপি। প্রতিটি ওষুধের রয়েছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। কারো ক্ষেত্রে হয় কম, আবার কারো ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রকট। শুধু ওষুধ দিয়ে যারা উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করান, তাদের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে একটি ওষুধে কাজ হলেও কিছুদিন পর দু-তিনটি ওষুধ নেয়ার পরও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হতে চায় না।

শুধু ওষুধ সেবন করে যে রোগী উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করে থাকেন, তিনি তো কোনোদিনই উচ্চ রক্তচাপের হাত থেকে রেহাই পান না, উপরন্তু ধীরে ধীরে একটা সময় তিনি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদিতে আক্রান্ত হন।

অথচ যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটি অন দ্য প্রিভেনশন, ডিটেকশন, ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রিটমেন্ট অব হাই ব্লাড প্রেশার (জেএনসিভিআই)-এর সর্বশেষ পরামর্শ হচ্ছে– স্টেজ-১ এবং স্টেজ-২ উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ওষুধ শুরু করার আগে কমপক্ষে ৩-৬ মাস ওষুধ না দিয়ে শুধু জীবন-অভ্যাস পরিবর্তন করে চিকিৎসা করা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস : চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা ধরেই নিয়েছি যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে একপর্যায়ে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়বে। এরপর ডাক্তারের কাছে যাব। ডাক্তার সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ খেতে দেবেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওষুধ খাওয়াই হচ্ছে নিয়তি। অথচ এটিই একমাত্র বাস্তবতা নয়।

গবেষকেরা ১৯২০ সালে কেনিয়ার গ্রামের কিছু মানুষের জীবনধারা নিয়ে গবেষণা করলেন। তাদের খাদ্যতালিকায় সোডিয়ামযুক্ত বা লবণাক্ত খাবার খুব কম থাকে। আর থাকে পূর্ণ শস্যদানা, পর্যাপ্ত শাকসবজি, ফল, ডাল-বীজ-বিন এবং খুব অল্প প্রাণিজ আমিষ। দেখা গেছে, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামীণ কেনিয়ানদের রক্তচাপ থাকে সমবয়সি আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের মতো ১২০/৮০ মি.মি. মার্কারি।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের রক্তচাপ বাড়তে থাকে, ৬০ বছর বয়সে তাদের রক্তচাপ হয় ১৪০/৯০-এর ওপরে। অথচ ৬০ বছর বয়সে কেনিয়ানদের রক্তচাপ; বরং আগের থেকে কমে দাঁড়ায় ১১০/৭০-এ। দু'বছর ধরে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এ সময়ে ১৮০০ মানুষ নানা কারণে কেনিয়ার গ্রামের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে একজনও উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিল না। এমনকি তাদের মধ্যে একজনেরও ধমনীতে চর্বি জমা বা হার্ট ব্লকেজের সমস্যা ছিল না।

উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে আধুনিক গবেষণা : যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক ডা. জুলিয়ান হুইটেকার ২৫ বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন। জীবনধারা পরিবর্তন করার পর একপর্যায়ে তার রোগীরা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ ছেড়ে দিয়েছেন এবং ওষুধ ছাড়াই সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

তার এ গবেষণার ফলাফল তিনি তুলে ধরেন রিভার্সিং হাইপারটেনশন গ্রন্থে। এছাড়াও যারা হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করছেন, তারাও জীবনধারা পরিবর্তন করে হৃদরোগ-ডায়াবেটিসের পাশাপাশি তাদের রোগীদের উচ্চ রক্তচাপও নিরাময় করতে সক্ষম হন।

উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে করণীয় : ⇨ স্থূলতা হ্রাস বা ওজন নিয়ন্ত্রণ, ⇨ মাছ মাংস ডিম দুধ বর্জন, ⇨ তেল ছাড়া খাবার গ্রহণ, ⇨ তেল-চর্বি-কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বর্জন, ⇨ চিনি ও অন্যান্য রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট বর্জন, ⇨ খুব কম লবণে রান্নার অভ্যাস করা এবং লবণযুক্ত খাবার বর্জন, ⇨ পর্যাপ্ত পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ, ⇨ পর্যাপ্ত এন্টি-অক্সিডেন্ট ভিটামিন ও নাইট্রিক অক্সাইড সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ, ⇨ ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ও কো-এনজাইম কিউ ১০ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ, ⇨ পর্যাপ্ত ফাইটোকেমিক্যাল সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ।

লেখাটি ডা. মনিরুজ্জামান ও ডা. আতাউর রহমান এর লেখা "এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ" শীর্ষক বই থেকে নেয়া। [একুশে টেলিভিশন অনলাইন]

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস, পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা-এর জন্য **একজন অধ্যক্ষ ও একজন বোর্ডিং সুপার আবশ্যক**। উল্লেখিত পদদ্বয়ে আগ্রহী প্রার্থীগণের নিকট থেকে নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হলো।

আবেদনের শর্তাবলী :

১। অধ্যক্ষকে অবশ্যই দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রিধারী হতে হবে। সেই সাথে আরব বিশ্বের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ-ডিগ্রীধারী প্রার্থীকে অথবা কামিল পাশ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং বোর্ডিং সুপারকে এইচএসসি/আলিম পাশ হতে হবে।

২। সালাফী 'আক্বীদায় বিশ্বাসী হতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে।

৩। মনোনীত অধ্যক্ষ সাহেবকে আবাসিক সুবিধাসহ মাসিক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা বেতন দেওয়া হবে। বোর্ডিং সুপারের বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

৪। অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ পদে কমপক্ষে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বোর্ডিং সুপারের জন্য ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫। আবেদনপত্রের সাথে সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের ৩ কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

৬। অধ্যক্ষের বয়স অনুর্ধ্ব ৪৫ এবং বোর্ডিং সুপারের বয়স অনুর্ধ্ব ৪০ বছর হতে হবে।

৭। আগ্রহী প্রার্থীদ্বয়কে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সভাপতি/সেক্রেটারি, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস, পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস

পুরাতন বাঁশ বাজার, শিবরামপুর, পাবনা।

✆ ০১৭১১৫২৪১৯৫, ০১৭৮৯৩১৭১২৩। ☎ ০২৫৮৮৮৪৫২৫০।

ই-মেইল : mdhpbd@gmail.com

মৃত্যু সংবাদ

বগুড়া তরফসরতাজ এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ও জেলা জমঈয়তের সাবেক মুবাল্লিগ মাওলানা এমদাদুল হক বার্ধক্যজনিত অবস্থায় গত ৮ মার্চ বুধবার ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ১০০ বছর। তিনি তরফসরতাজ ফাজিল মাদ্‌রাসার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় মোবাল্লিগের দায়িত্বও পালন করেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় ছাইহাটা দাখিল মাদ্‌রাসায় তার প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়, ইমামতি করেন বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আহমাদ আল মুতি। দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দুপুর ২টায় তার নিজ গ্রাম চকধনাই পদ্মপাড়া ঈদগাহে, উক্ত জানাযার ইমামতি করেন তার ছেলে মাওলানা মো. মুজাহিদুল ইসলাম; অতঃপর মাইয়্যিতের দাফন সম্পন্ন হয়। তার মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দু'আ চেয়েছেন বগুড়া জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি আবু নসর মুহাম্মদ ইয়াহইয়া।

সচেতনতা

০১. আপনি প্রতিনিয়ত যে খাদ্য অপচয় করছেন, সে খাদ্যেই একজন গরীব-দুঃখী, অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ হতে পারে। আসুন! আমরা মানবিক গুণ অর্জন করি : অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ করি।

০২. পানি আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত নি'আমাত। অযথা পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে নোংরা করা থেকে বিরত থাকি এবং পানির অপচয় রোধ করি।

০৩. বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ। তাই বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকি। আমাদের একটু সচেতনতা বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

০৪. প্রাকৃতিক গ্যাস একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু আমাদের কাছে এর মজুদ সীমিত। তাই এই সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করি।

০৫. পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অন্তত ভবিষৎ প্রজন্মের কথা ভেবে হলেও ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে আমার চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

০৬. খাদ্যে ভেজাল জাতি ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার, বিভিন্ন রোগের প্রধান উপসর্গও বটে। আমরা কেউই এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ নই। খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারীর বিরুদ্ধে গণসচেতনা গড়ে তুলি।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***২.৫ শতক জমির উপর আমাদের একটি মসজিদ ছিল। কালক্রমে মুসল্লী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা অন্যত্র ৫০ শতক জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করি এবং পূর্ববর্তী ২.৫ শতক মসজিদের জমি বিক্রি করে নতুন মসজিদের কাজে ব্যয় করি। এখন প্রশ্ন হলো– আমরা যে ব্যক্তির কাছে পূর্ববর্তী মসজিদের জমি বিক্রি করেছি, তিনি কি সেখানে বসতবাড়ি নির্মাণ করতে পারবেন?***

মুহাম্মদ ফিরোজ, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জবাব : ওয়াকফের জমি সাধারণত বিক্রি করা জায়িয নয়। তবে সেটি যদি ওয়াকফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বা লক্ষ্যার্জনে বাধা হয়, তাহলে সেটি বিক্রি করে অন্যত্র স্থানান্তর জায়িয আছে। মসজিদ ছোটো হওয়ায় তাতে মুসল্লি সংকুলান হচ্ছে না এবং মসজিদ সংলগ্ন জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে না, পরিস্থিতি এমন হলে ঐ মসজিদের জায়গা ও অবকাঠামোর বিক্রয়যোগ্য অংশ বিক্রি করে অন্যত্র জায়গা ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। আর পূর্বের মসজিদের জায়গা ও স্থাপনার সবটুকুই এ মসজিদে ব্যয় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পুরাতন মসজিদের জায়গাটি ক্রেতা তার বৈধ ও ন্যায়ানুগ যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে। *(দেখুন : আল-মুগনী- ৫/৩৬৮; ফাতওয়া শাইখ বিন বায ও লাজনা দায়িমাহ- ১৬/৩৮ পৃ.)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***"ওয়ান নাহী আনিল মুনকার"-এর প্রকৃতি ও পরিধি ব্যাখ্যাসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।***

ইশতিয়াক
শার্শা, যশোর।

জবাব : ইসলামী শরিয়তে 'মুনকার' বা গর্হিত কর্ম ও বিশ্বাস বলতে যা বুঝায় তা সবই এর পরিধিভুক্ত। সর্বাবস্থায় গর্হিত কাজ প্রতিহত করা মুসলিমগণের কর্তব্যের আওতায় পড়ে। তবে কখনো এমন কিছু মুনকার আছে, যা থেকে বাধা দেওয়া ফর্‌য হয়ে যায়। মুনকার কাজের প্রকৃতি বা ধরন, মুনকার কাজে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান এবং নিজের সক্ষমতা বিচার করে তা প্রতিহতের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

"বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারী জাগ্রত জ্ঞানসহ আল্লাহর দিকে আহ্বান করি"– *(সূরা ইউসূফ : ১০৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾

"তুমি হিকমাত/সুন্নাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের দিকে ডাকো এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের জবাব দাও!"– *(সূরা আন্ নাহ্‌ল : ১২৫)*। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন :

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ».

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো মুনাকার কাজ দেখবে, সে যেন তা তার হাত দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জবান দ্বারা প্রতিবাদ করবে। অগত্যা সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এটির দুর্বলতম ঈমানের পরিচয়।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৪৯)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***ছাগলের বাচ্চা যদি কুকুর অথবা শুকরের দুধ পান করে বড়ো হয়, সেই ছাগলের মাংস খাওয়া কী আমাদের জন্য হালাল হবে? জানিয়ে উপকৃত করবেন?*** *মাহবুব, মির্যাপুর, বগুড়া।*

জবাব : হারাম প্রাণীর দুগ্ধ যদি কোনো হালাল প্রাণী পান করে থাকে, তাহলে ঐ হালাল প্রাণীর গোস্ত

খাওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে হালাল প্রাণীকে সর্বনিম্ন তিন দিন আটকে রেখে পবিত্র খাবার খাওয়াতে হবে। অতঃপর সে প্রানীটি জবেহ করে খাওয়া যাবে– *(মুসনাদ আহমাদ; জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান আবূ দাউদ; ইরওয়া- হা. ২৫০৩; আসনাল মাত্বালিব- ১/৫৬৮ ও কাশ্শাফুল ক্বেনা' আ- ৬/১৯৩)*। মনে রাখতে হবে যে, কুকুরে মধ্যে বিষাক্ত জীবাণু থাকে যার ক্ষতি মারাত্মক। তাই ছাগলটিকে তিন দিন আটকে রেখে ভালো খাবার দেওয়ার পর তার শরীরে বিষাক্ত জীবাণু অবশিষ্ট আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া উচিত। –ওয়াল্লা-হু আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমরা জানি সালাতের রুকন আছে এবং সালাতের মধ্যে কতিপয় কার্যাবলী ওয়াজিব, কতিপয় সুন্নত এবং কতিপয় নফল। সওমেরও কি তদ্রূপ আছে। সওমের ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল কী কী?***

এম. ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : জী, সিয়ামের ফর্‌য, ওয়াজিব এবং সুন্নাত রয়েছে। ফর্‌য হলো– নিয়ত ও সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা। ওয়াজিব হলো– ফর্‌য সিয়ামের জন্য সুবহে সাদিকের আগে নিয়ত করে ফেলা। আর সুন্নাত হলো– সুহুর খাওয়া, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করা, খেজুর দ্বারা কিংবা পানি দ্বারা ইফতার করা, ইফতারের পূর্বে বেশি বেশি দু'আ করা, বিস্‌মিল্লা-হ বলে খাওয়া, খাওয়ার শেষে মাসনুন দু'আ পাঠ করা ইত্যাদি। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***সনদের মানদণ্ডে হাদীস কত প্রকার ও কী কী? এ বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে চাই।***

আব্দুল করিম
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : সনদের মানদণ্ডে হাদীস প্রথমত দুই প্রকার। **এক-** গ্রহণযোগ্য, **দুই-** অগ্রহণযোগ্য। গ্রহণযোগ্য হাদীস আবার দুই প্রকার। যথা- **এক.** মুতাওয়াতির, **দুই.** আহাদ। আহাদ আবারা তিন প্রকার। যথা- মশহুর, 'আযীয ও গরিব। অনুরূপভাবে সহীহ, হাসান, মাকবুল, য'ঈফ ও মাওযূ' ইত্যাদি। এগুলোরও আবার প্রকার বা শ্রেণিভেদ রয়েছে। তাই বিস্তারিত জানতে উসুলে হাদীসের গ্রন্থাদি দেখুন।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***সালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ। প্রশ্ন হলো– কতটুকু সামনে দিয়ে? সাজদার স্থান পর্যন্ত নাকি আরও সামনে দিয়ে যাওয়াও নিষেধ?***

আরিফুর রহমান, কেশবপুর, যশোর।

জবাব : মুসল্লি একাকী সালাত আদায় করলে বা ইমাম হলে তার সামনে সুতরা দিতে হবে। সুতরা ও মুসল্লির মাঝখান দিয়ে যাওয়া নিষেধ। সুতরার বাহির দিয়ে যাওয়ায় কোনো দোষ নেই। যদি মুসল্লি সুতরা না ব্যবহার করে, তাহলে ঐ মুসল্লির সাজদার স্থান হতে সুতরা দেওয়ার স্থান পরিমাণ রেখে বিশেষ প্রয়োজনে কেউ সামনে দিয়ে গমন করলে করতে পারেন। তবে এমন কোনো জরুরি না হলে ঐ লোকের সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষাই অধিকতর নিরাপদ।– ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***কোনো বাচ্চাকে দুগ্ধপান করালে সে তার দুধমা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই সন্তান কি উক্ত পিতা-মাতার সম্পদের কোনো ভাগ পাবে? দলিল সহকারে বুঝিয়ে দিলে কৃতার্থ হতাম।***

জ্যোতি বাবু, খুলনা।

জবাব : দুধ পান করানোর মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হয়; ওয়ারিশ হয় না। তাই সেই সন্তান দুগ্ধমাতার বা পিতার সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকার বা অংশ পাবে না। আল-কুরআনে বর্ণিত সম্পদ বন্টন নীতিমালায় সেটি প্রমাণিত নয় এবং হাদীস দ্বারাও তা সমর্থন করে না, বিধায় সেটিই তার দলিল। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***রামাযান মোবারক বলা যাবে কি? দলিলসহ জানানোর অনুরোধ।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দিঘলিয়া, খুলনা।

জবাব : মোবারক বিশেষণটি যত্রতত্র ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে রামাযান মাস সিয়াম ও কুরআনের কারণে বরকতময় হয়েছে, বিধায় এ মাসটিকে মোবারক বা বরকতময় মাস বলা যাবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আমার মা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। বাবা এখন যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে তার আগের পক্ষের মেয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো– আমার বাবা সেই মহিলাকে বিয়ে করার পর আমি কি তার আগের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, শর্শা, যশোর।

জবাব : আপনার পিতা যে মহিলাকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন, তার পূর্বের স্বামীর কন্যাকে আপনি বিয়ে করতে পারেন যদি দুগ্ধ পান দ্বারা সে আপনার জন্য

হারাম না হয়। কেননা ঐ মহিলার পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বিবাহ অবৈধ নিকটাত্মীয়-এর মধ্যে পড়ে না– *(সূরাহ্ আন্ নিসা : ২৪)*।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***বালতি থেকে গোসল করার সময় শরীরের কিছু পানি বালতিতে গিয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– সেই পানি দিয়ে কি ওযূ করা যাবে?***

মো. আইয়ুব আলী
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব : এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ আছে। একদল মনে করেন– ব্যবহৃত পানি যদি তাতে অপবিত্র কিছু না পড়ে, তাহলে সাধারণত তা পাক। তবে এ পানি অন্যকে পবিত্র করতে পারে না। অর্থাৎ- ব্যবহৃত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় না– *(দেখুন : আল-মাজমূ'আ ও আল-মুগনী- ১/৩১)*। হাফিজ ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এটাই সর্বাধিক দৃঢ় দলিল যে, ব্যবহৃত পানি স্বয়ং নিজে পাক হলেও অপরকে পাককারী নয়"– *(ফাতহুল বারী- ১/৩৪৭)*। তবে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতে যেসব পানি পবিত্র, তদ্বারা পবিত্রতা অর্জনও বৈধ– *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া- ১৯/২৩৬)*। বিশুদ্ধ মতে আপনি যদি পবিত্র জায়গায় গোসল করেন এবং সামান্য ছিটেফুটা ব্যবহৃত পানি বালতিতে গিয়ে পড়ে, তাহলে তদ্বারা ওযূ করলে আপনার ওযূ সঠিক হবে ইন্শা-আল্লাহ। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***আমাদের জমঈয়তের যে সমস্ত ক্যালেন্ডার, ফেস্টুন বা সালাতের পরে দু'আর বোর্ডগুলো রয়েছে, সেগুলো কি মসজিদের ভিতরের সাইডে (সামনে নয়) লাগানো যাবে? এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস লিখে মসজিদের বারান্দায় টাঙ্গিয়ে দেওয়া যাবে কি?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাবনা।

জবাব : সালাতে মুসল্লিগণের মনোযোগ বিনষ্টের কারণ না হলে দু'আ, আযকার ও সালাতের সময়সূচি মসজিদ কিংবা তার বারান্দায় টানিয়ে রাখাতে কোনো অসুবিধা দেখছি না। তবে সালাতে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী কোনো কিছু ক্বিবলার দিকে রাখা সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ চাকচিক্যময় বস্তু সামনের দিক থেকে সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৫৫৬)*। অতএব, কুরআন-হাদীসের বাণী মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তা মসজিদের ভিতরের সাইডে বা বারান্দায় লাগানো দোষের কিছু না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***সালাতুল বিত্‌রে দু'আ কুনুত রুকূ'র আগে না রুকূ'র পরে হাত তুলে পড়তে হয় দলিল সহকারে জানতে চাই।*** *মামুন, খালিশপুর, খুলনা।*

জবাব : সালাতুল বিত্‌র-এ দু'আয়ে কুনূত রুকূ'র আগে কিংবা রুকূ'র পরে দুই নিয়মে পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর হাত তোলার বিষয়টি সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-গণের 'আমল দ্বারা সাব্যস্ত। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***আমাদের এলাকার এক মসজিদে তারাবি সালাতের পর বিতর সালাতের শেষ রাকআতে রুকূ'র আগে ইমাম সাহেব দু'আ কুনুত "আল্লাহ হুম্মাদিনা..." পড়েন এবং প্রতি বাক্য শেষে মুসল্লিরা জোরে জোরে আমীন বলেন। এটা কতটা সঠিক দলিলসহ জানতে চাই।*** *মহসিন, খুলনা।*

জবাব : রুকূ'র আগে কুনূতের দু'আ পাঠ করা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– *(ইবনু উসাইমীন 'শারহুল মুমতি'আ'- ৪/৬৪)*। আর কুনূতে পঠিত দু'আর যে বাক্যগুলোতে দু'আ আছে, সেগুলোতে মুসল্লিগণ 'আমীন' বলতে পারেন। এটি সালাফগণের 'আমল দ্বারা সাব্যস্ত– *(প্রাগুক্ত- ৪/৪৭ ও বক্র আবূ যায়েদ 'তাসহীহুদ দু'আ'- ৪১৯-৪২৩)*।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলে ইজতিবা করার কথা বলা হয়। আসলে ইজতেবা কী? এটা কিভাবে করতে হয় এবং এর গুরুত্ব কতখানি? জানিয়ে ধন্য করবেন।*** *তানযিলা, কেশবপুর, যশোর।*

জবাব : ইজতেবা আল্লাহর ঘর তাওয়াফকারী পুরুষের জন্য একটি বিশেষ 'আমলের নাম। আর তা হলো– ইহরামের কাপড়ের যে টুকরা দেহের উপরাংশ আবৃত করা হয়, তা তাওয়াফ কালে ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপরে ফেলে দেয়া। এভাবে করলে ডান কাঁধ খালি থাকবে। এটি করা সুন্নাত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আল-জা'রানা হতে 'উমরাহ্ করার সময় এরূপ করেছিলেন। *(আহমাদ- হা. ২৭৯২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮৮৪)*

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***আমরা সাধারণত সফর অবস্থায় ক্বসর করে থাকি। একদা এক সফরে একজন সালাফী আলেমকে দেখতে পেলাম– তিনি স্থানীয় ইমামের***

অনুরোধে সালাতে ইমামতি করলেন এবং ক্বসর না করে পূর্ণ সালাত আদায় করলেন। আমার প্রশ্ন হলো– এভাবে সফর অবস্থায় ক্বসরের বদলে পূর্ণ সালাত আদায় করা যাবে কি? দয়া করে দলিলসহ জবাব দিয়ে ধন্য করবেন।

মো. আবূ তাহের বাদল
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

জবাব : সফর অবস্থায় ক্বসর করা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর অন্যতম। ইসলাম যে সর্বজনীন এবং সহজ দ্বীন, এটাই তার প্রমাণ। সফরের ক্লান্তির মাঝে আল্লাহ সালাতকে ক্বসর করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ক্বসর করাই উত্তম। তবে কেউ চাইলে পুরো সালাত আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্বসর করার বিধানের দলিলেই এটার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾

“আর যখন তোমরা যমীনে চলো, তখন সালাত ক্বসর করাতে কোনো দোষ নেই। যদি তোমরা কাফিরদের ফিতনার আশংকা করো। নিশ্চায়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন”– *(সূরা আন্ নিসা : ১০১)*। নবী (ﷺ)-কে ভয়-ভীতি ছাড়া ক্বসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বলেন : “এটি একটি সাদাক্বাহ্। আল্লাহ তদ্বারা তোমাদেরকে সাদাক্বাহ্ করেছেন। কাজেই তোমরা তার সাদাক্বাকে গ্রহণ করো”– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮৬)*।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : “আমরা যখন তোমাদের (মুক্বীম) সাথে হই, তখন ৪ রাকআত পড়ি। আর যখন আমাদের (মুসাফিরদের) দলে ফিরে যাই, তখন ২ রাকআত পড়ি। এটি আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর *সুন্নাত*”– *(বুখারী- ১০৮২; আহমাদ- ১৮৬২; মুসলিম- হা. ৬৮৮)*। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-গণ মিনায় সফর অবস্থায় ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে ৪ রাকআত সালাত আদায় করেছেন– *(বুখারী- হা. ১০৮৪ ও মুসলিম- হা. ৬৯৫)*। অনুরূপভাবে ‘আয়িশাহ্ ও সা’দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে সফরে ৪ রাকআত সালাত আদায় করেছেন মর্মে প্রমাণ রয়েছে– *(ইবনুল মুনযির- ৪/৩৩৫)*।

উপরোক্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, চাইলে কোনো মুসাফির মুক্বিমের ন্যায় পুরো সালাত আদায় করতে পারেন। আর যদি মহান আল্লাহর হাদিয়া গ্রহণ করে ক্বসর করেন, তাহলে সেটি উত্তম বলে বিবেচিত হবে। কাজেই হে প্রশ্নকারী! আপনি যে সালাফী আলেমকে সফর অবস্থায় পুরো সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি হয়তোবা কোনো প্রয়োজনে উপরোক্ত দলিল জেনেই সাধারণ বৈধ মনে করে সফরেও পুরো সালাত আদায় করেছেন।

জিজ্ঞাসা (১৬) : এ বছর আমি হাজ্জ করার নিয়ত করেছি। আমার একটা রোগ রয়েছে যা হঠাৎ আক্রমণ করে। তখন আমি প্রায় অচল হয়ে পড়ি। আমার ভয় হয়, যদি হাজ্জের মৌসুমে আমি এই রোগে আক্রান্ত হই, তখনতো আমার পক্ষে হাজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় আমি কি করব? দয়া করে সঠিক উত্তর দিয়ে পেরেশানী দূর করবেন।

আ. রাকিব হাওলাদার, পীরগাছা, রংপুর।

জবাব : হজ্জ ফর্‌য হওয়ার জন্য বিশেষ শর্ত হলো শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা। প্রশ্ন মতে, জানা যায় যে, আপনি উভয় শর্ত বিবেচনায় ফর্‌য হজ্জ আদায় করতে যাচ্ছেন। আর আপনার অসুখটি অনিয়মিত। হঠাৎ হঠাৎ আক্রান্ত হন। কখন আক্রমণ করে তাও জানেন না। হয়তো বা হজ্জ পালনকালীন আক্রান্ত নাও হতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি মিকাত হতে ইহ্‌রাম বেধে হজ্জে প্রবেশ কালে নিয়তের মধ্যে শর্ত সংযোজন করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই মর্মে শর্তারোপের পরামর্শ দিয়েছেন। আপনি নিয়তের সময় স্থির করবেন।

«أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

অর্থাৎ- আমি তখনই ইহরাম মুক্ত হয়ে হালাল হয়ে যাবো, যখন ঐ রোগ আমাকে (আক্রান্ত করে) আটকিয়ে দেবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১২০, মা. শা., হা. ১০৫/১২০৭)*

জিজ্ঞাসা (১৭) : বাংলাদেশের হাজীদের মীকাত কোনটি? তারা কি বিমানে জেদ্দা অবতরণ করে সেখান থেকে ইহরাম বাধবে না তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে সেখান থেকে ইহরাম বাধা ওয়াজিব?

ইশতিয়াক চৌধুরী, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : বাংলাদেশের হাজীরা পানি জাহাজে গমন করলে তাদের মীকাত হবে ইয়ালামলাম পাহাড়, যা ইয়ামেনে অবস্থিত। আর উড়োজাহাজে সফর করলে তাদের মিকাত হবে কারনুল মানাযিল– যা আইল কাবীর নামে প্রসিদ্ধ (বর্তমান তায়েফ বরাবর)। এই স্থান বরাবর হলেই হাজী সাহেবদের হাজ্জে প্রবেশের নিয়ত করতে হবে। অর্থাৎ- এটাই তাদের মিকাত। ইহরাম ছাড়া এটা অতিক্রম করা জায়িয নয়। কেউ বিনা ইহরামে মিকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধতে হবে। নতুবা ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার জন্য একটি দম তথা কুরবানী আবশ্যক। জিদ্দাকে মিকাত মনে করার কোনো দলিল নেই। কাজেই ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর 'আমল করা আদৌ ঠিক না। ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৭৩৯; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৫৬; সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮১)***

জিজ্ঞাসা (১৮) : স্বামীর সম্পদ আছে কিন্তু স্ত্রীর তেমন কোনো সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে হজ্জ করানো স্বামীর ওপর ফর্‌য হবে কি?

মো. আলী হায়দার

বংশাল, ঢাকা।

জবাব : হজ্জ ফর্‌য হওয়ার জন্য নিজের মাল থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"আর আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষের ওপর বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফর্‌য, যে সেথায় পৌঁছার সামর্থ্য রাখে"– ***(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭)***। যেহেতু স্ত্রীর নিজের হজ্জ সফর আঞ্জাম দেয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই, তাই তার ওপর হজ্জ ফর্‌য হবে না। আর স্বামী তার স্ত্রীর হাজ্জ করিয়ে দিতে বাধ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা একের দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দেন না। যদি স্বামী নিজ অর্থ ব্যয় করে স্ত্রীর হজ্জ করিয়ে দেয়, তাহলে তা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ইহসান বলে বিবেচিত হবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৯) : আমাদের এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় ঈদের সালাতে মহিলা জামা'আত ও মহিলা ইমাম দ্বারা খুতবাহ্ ও সালাত পরিচালিত হয়ে আসছে। এখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এভাবে সালাত আদায়ের যৌক্তিকতা জানতে চাই।

আতিকুর রহমান

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

জবাব : মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে মুসলিমদের জামা'আতে শামিল হয়ে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। মহিলারা ঈদগাহে না গিয়ে আলাদা জামা'আত করে সালাত আদায় করার কোনো বিধান ইসলামী শরিয়তে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও বাদ দেননি। তারা সালাতে শামিল হবে না; তবে কল্যাণময় এ সমাবেশ প্রত্যক্ষ করবে এবং মুসলিমদের দু'আয় শরিক হবে। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৮৯০)***

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদের জন্য পৃথক জামা'আতের নির্দেশ দেননি, সেহেতু প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থায় মহিলা জামা'আত সুন্নাতসম্মত হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (২০) : আমরা সহীহ হাদীসের অনুসারীদের কাছ থেকে জেনেছি যে, নিয়ত মনের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করা বিদআত। তাহলে হাজীদেরকে কেন উচ্চারণ করে لبيك حجا বলতে শিখানো হয়? এটা কি মুখে নিয়ত পাঠ নয়? এ সংক্রান্ত সন্দেহ দূর করার স্বার্থে দলিলসহ ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়।

আয়েশা সিদ্দিকা

কুড়িগ্রাম।

জবাব : হজ্জে প্রবেশের সময় প্রিয় নবী (ﷺ) এভাবে উচ্চারণ করে لبيك حجا বলেছেন– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১২৩২)***। এটি হাজ্জের নিয়ত নয়; বরং হজ্জের প্রবেশের ঘোষণা মাত্র। ইমাম ত্বাবারী, কুরতুবী ও ইবনু কাসীর (রাহিমাহুমুল্লাহ) এই 'লাব্বাইক' বলাকে মহান আল্লাহর ডাক–وأذن في الناس بالحج-এর জবাব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই এটিকে কোনোভাবে তথাকথিত নিয়ত বলা যাবে না– ***(আল-বাস্‌সাম "তাওযীহুল আহকাম"- ৩/৩৩৮)***। –ওয়াল্লাহু আ'লাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

পৃথিবীর প্রথম ঘর বায়তুল্লাহ বা কা'বা

–আবু ফাইয়ায

পৃথিবীর প্রথম ঘর কোন্‌টি? কোথায় অবস্থিত? কে এই ঘরের নির্মাতা? কখন নির্মাণ করা হয়? এমন অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। হ্যাঁ! আল্লাহর ঘর 'কা'বাকে নিয়ে আমাদের এ সকল জিজ্ঞাসা। মহাসম্মানিত এ ঘরটি জাজিরাতুল আরবের পুণ্যভূমি মক্কাতে অবস্থিত। আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

"নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা পবিত্র মক্কায় মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। এটি বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য দিশারীস্বরূপ।"[১০৫]

পবিত্র কা'বাগৃহ : ভৌগোলিকভাবে ডিম্বাকৃতি পৃথিবীর মধ্যস্থলে কা'বা বা বায়তুল্লাহ'র অবস্থান। পবিত্র এ গৃহের দৈর্ঘ্য ১২ মিটার ও প্রস্থ ১০ মিটার। একটি সমতল ক্ষেত্রের মাঝখানে অবস্থিত এ ঘরের চারদিকে রয়েছে মাসজিদুল হারাম। এই পবিত্র ঘর খুবই সাদামাটা ও জাঁকজমকহীন হওয়া সত্ত্বেও দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, মনোমুগ্ধকর এবং ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর। পবিত্র কা'বার সাদামাটা সৌন্দর্য ও অনাড়ম্বরতা তাঁকে দিয়েছে অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব। সৌদি গেজেট মতে, কাবাগৃহের উচ্চতা পূর্ব দিক থেকে ১৪ মিটার (অন্য একটি সূত্র মতে ১২.৮৪ মিটার)। পশ্চিম দিক থেকে ১২.১১ মিটার। উত্তর দিক থেকে ১১.২৮ মিটার। দক্ষিণ দিক থেকেও ১২.১১ মিটার। *[সূত্র : সৌদি গেজেট, ৩ জানুয়ারি, ২০১০।]* ভূমি থেকে কা'বার দরজার উচ্চতা ২.৫ মিটার। দরজার দৈর্ঘ্য ৩.০৬ ও প্রস্থ ১.৬৮ মিটার। বর্তমান দরজাটি বাদশা খালিদ প্রদত্ত উপহার, যা নির্মাণে প্রায় ২৮০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সিলিং তিনটি কাঠের পিলার ধরে রেখেছে। প্রতিটি পিলারের ব্যাস ৪৪ সে.মি.। পবিত্র কা'বার ভেতরের দেয়ালগুলো সবুজ ভেলভেটের পর্দা দিয়ে আবৃত। এর ছাদে ১২৭ সে.মি. লম্বা ও ১০৪ সে.মি. প্রস্থের একটি ভেন্টিলেটর রয়েছে, যা দিয়ে ভেতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। এটি একটি কাচ দিয়ে ঢাকা থাকে।

হারাম অঞ্চল : এ ঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে হারাম অঞ্চল। বায়তুল্লাহ বা পবিত্র কা'বার কারণে মক্কাকে করা হয়েছে সম্মানিত। তাই এ নগরীর নামকরণ করা হয়েছে 'মক্কা আল-মুকাররমা' বা সম্মানিত মক্কা। আর এ ঘরে চতুর্দিকের নির্দিষ্ট স্থান নিয়ে গড়ে উঠেছে 'হারাম' অঞ্চল। 'হারাম' শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ- এ ঘরের পবিত্রতা, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার স্বার্থে কিছু বৈধ ও হালাল কাজ এ অঞ্চলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- এ সীমানার মধ্যে অমুসলিমদের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া জীব-জন্তু শিকার, এমনকি এ সীমানার মধ্যকার গাছপালা-তৃণলতা ছেঁড়াও নিষেধ। মাদীনাতুল মুনাওওয়ারায় অবস্থিত নাবী (ﷺ)-এর মসজিদ 'মসজিদে নাববী'কে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে জাজিরাতুল আরবের দ্বিতীয় 'হারাম অঞ্চল'। আর এ দুই হারাম অঞ্চলকে একত্রে বলা হয় 'হারামাইন শারীফাইন'।

বায়তুল্লাহ বা কা'বার চতুর্দিকে হারাম বা নিষিদ্ধ অঞ্চলের সীমানা হলো, পশ্চিমে জেদ্দার পথে শুআইদিয়া পর্যন্ত ১০ মাইল, পূর্বে জেরুজালেমের পথে ৯ মাইল, দক্ষিণে তায়েফের পথে ৭ মাইল, উত্তরে মাদীনার পথে ৫ মাইল।

পবিত্র কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব : নিঃসন্দেহে পবিত্র কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর সকল কিছুর উর্ধ্বে। এ গৃহটি পৃথিবীতে আল্লাহর জীবন্ত নিদর্শন। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ কা'বাকে তাঁর মনোনীত বান্দাদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে কবুল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ঘরের গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"এতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, মাকামে ইব্‌রাহীম। আর যে এ ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে।"[১০৬]

প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে এই ঘরকে ঘিরে বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলেই 'যাইফুর রহমান' বা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত মেহমান। এছাড়া মানুষ পৃথিবীর যে স্থানেই বসবাস করুক না কেন, প্রতিদিন ন্যূনতম পাঁচবার কা'বার দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ- কা'বাকে কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায় করে। মানুষের যখন প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের (এস্তেঞ্জা) প্রয়োজন পড়ে, তখন এই পবিত্র গৃহকে না সম্মুখে রাখে, আর না পিছনে– এই ঘরের বিশেষ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম এ বিধান জারি করেছে। পশু যবেহ করার সময়ও মানুষ তার উপর আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করে কিবলা তথা কা'বাকে সম্মুখে রাখে। সবশেষে মানুষ যখন এ দুনিয়া ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করে, তখনও তার মুখকে কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এক কথায় বলা যায় যে, একজন মু'মিনের জীবন পবিত্র কা'বাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত– পৃথিবীর যে প্রান্তেই তিনি বসবাস করুন না কেন।

[১০৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৬।*

[১০৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৭।*

পবিত্র কা'বা হলো কিবলা : কিবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার আগে থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুভব করছিলেন, ইসরা'ঈল বংশীয়দের নেতৃত্বের যুগের অবসান ঘটেছে এবং সেই সাথে বায়তুল-মাকদিসের পরিবর্তে মহাসম্মানিত কা'বার কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। এখনই ইব্রাহীমী কিবলার দিকে মুখ ফিরানোর সময়। কা'বা মুসলিমদের কিবলা সাব্যস্ত হোক– এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক ইচ্ছা-বাসনা। এজন্য তিনি সুমহান আল্লাহর নিকট দু'আও করছিলেন। আর এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন যে, ফেরেশ্তা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কি না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন :

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا...﴾

"আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ করো। অতএব (সালাতে) তুমি মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বাগৃহের) দিকে মুখ ফেরাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, (সালতে) সেই (কা'বার) দিকে মুখ ফেরাও।"[১০৭]

এ আয়াতাংশটি কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত মূল নির্দেশ; যা তৃতীয় হিজরীর রজব বা শা'বান মাসে নাযিল হয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল ﷺ তখন– বর্তমানে যেখানে মসজিদ কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– সেখানে যোহরের সালাতে ইমামতি করছিলেন। ইতোমধ্যে দু'রাকআত সালাত সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময় তৃতীয় রাকআতে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হলো, আর সাথে সাথে তিনি তাঁর জামা'আতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদেরকে নিয়ে বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন।[১০৮] তখন থেকেই মুসলিমদের কিবলা 'বায়তুল্লাহ বা কা'বা'।

এরপর মদীনা ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হলো। সাহাবী বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা এমন অবস্থায় পৌঁছল, যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই সবাই সে অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ খবরটি কুবায় পৌঁছল পরের দিন ফজরের সালাতের সময়। লোকেরা এক রাকআত সালাত শেষ করেছিল, এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছল, 'সাবধান! কিবলা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং কা'বার দিকে কিবলা নির্দিষ্ট হয়েছে। এ কথা শুনার সাথে সাথেই জামা'আতে অংশগ্রহণকারী সকল মুসল্লী কা'বার দিকে মুখ ফিরালো।

প্রথম ঘর কা'বা : আল্লাহ তা'আলা নিজগৃহ কা'বাকে সমগ্র বিশ্বের প্রথম গৃহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কখন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমের সূরা আ-লি 'ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে তাফসীর উল্লেখ করা হলো– যা খাদিমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"প্রাচীনকাল থেকেই কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে وُضِعَ لِلنَّاسِ শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এ গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর স্বাভাবিক নিয়মে এক অবচেতন মনেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

আলোচ্য আয়াতে কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম 'ইবাদতের স্থান। দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার। তৃতীয়তঃ এ গৃহ সমগ্র সৃষ্টির জন্য পথপ্রদর্শক ও আলোকবর্তিকা। আয়াতে বর্ণিত প্রথম শ্রেষ্ঠত্বের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কায় অবস্থিত। 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে মক্কার অপর নাম বাক্কা। অতএব কা'বাগৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম 'ইবাদত ঘর। তখন অর্থ হবে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু 'ইবাদতের জন্য কা'বাগৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে। এ মতটি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত রয়েছে[১০৯]। তাছাড়া আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ 'ইবাদতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতোঃপূর্বে কোনো উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাসগৃহও ছিল না। এ কারণে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বাগৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এটি বিশ্বজগতের সর্বপ্রথম গৃহ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ﷺ-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তর

[১০৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৪।*
[১০৮] *তাবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২৪২।*
[১০৯] *দিয়া আল-মাকদেসী, আল মুখতারাহ- ২/৬০ নং ৪৩৮।*

হলো– মাসজিদুল হারাম। আবারো প্রশ্ন করা হলো– এরপর কোনটি? উত্তর হলো– মাসজিদে বায়তুল-মাকদিস। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুটি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলো, চল্লিশ বছর।[১১০]

এ হাদীসে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর হাতেই কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলে বুঝা যায়। তাই সবচেয়ে প্রামাণ্য সঠিক মত হলো, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-ই সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কারণ এ হাদীসে বায়তুল-মাকদিস (মাসজিদে আকসা) নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। আর বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বায়তুল-মাকদিসের প্রথম নির্মাণও ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর হাতেই হয়েছে, যা কা'বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পর সম্পন্ন হয়। এরপর সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) বায়তুল-মাকদিসের পুনর্নির্মাণ করেন।

এছাড়া কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, কা'বাগৃহ সর্বপ্রথম আদম (আলাইহিস সালাম) নির্মাণ করেছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে– আদম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক নির্মিত এই কা'বাগৃহ নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। উপরিউক্ত দু'টি বর্ণনার কোনটিই সঠিক সনদে প্রমাণিত হয়নি। তাই আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কেই কা'বাগৃহের প্রথম নির্মাণকারী বলতে পারি। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় এবং একবার কুরাইশরা এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। আর সর্বশেষ নির্মাণে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্রাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ হাতীম কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নির্মাণে কা'বাগৃহের দরজা ছিল দু'টি– একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশরা পুনঃনির্মাণের সময় শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে, অন্যটি বন্ধ করে দেয়। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে– যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে; বরং তারা যাকে অনুমতি দেবে, সে-ই যেন প্রবেশ করতে পারে।

হাদীসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাগৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেওয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।[১১১]

এ কথার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ভাগ্নে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের অবগত ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরিউক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বাগৃহের নির্মাণ ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশি দিন টেকেনি। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাকে শহীদ করে দেয়। সে কা'বাগৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলে কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পর কোনো কোনো বাদশাহ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বাগৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করে ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র কাছে ফাতাওয়া চান। তিনি তখন ফাতাওয়া দেন যে, এভাবে কা'বাগৃহের ভাঙ্গা-গড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বাগৃহ তাদের হাতের একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তার এ ফাতাওয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটোখাটো কাজ বা সংস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকে। বর্তমান আমলে বেশ কয়েক বছর পূর্বে সাবেক খাদেমুল হারামাইন এক সংস্কার কাজ করে কা'বাগৃহের সৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত করেন।"

পবিত্র কা'বার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে বরকতময় বহু নিদর্শন। যেমন- মাকামে ইব্রাহীম, মুলতাজিম, হাজরে আসওয়াদ, মিজাবে রহমত, হাতিম, মাতাফ, রুকনে ইয়ামানী। এগুলো প্রত্যেকটি বরকতের আধার। এগুলোর কাছে থেকে দু'আ করলে তা কবুল হয়। পবিত্র কা'বার পানে মু'মিন হৃদয় বারবার ছুটে যায়। এটি পবিত্র কা'বার বিস্ময়কর এক বৈশিষ্ট্য বটে। আধুনিক দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম কোনো মনোরম দৃশ্য বা পর্যটনস্পট এক-দু'বার পরিদর্শনেই মানব-মন পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শুষ্ক বালুকাময় মরু আরবের কা'বাগৃহের না আছে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না আছে চিত্তাকর্ষক কোনো বস্তু। তবুও সেখানে পৌঁছানোর আকুল আগ্রহ মুমিনের মনে ঢেউ খেলতে থাকে। সে আগ্রহে কখনোই ভাটা পড়ে না। ❑

[১১০] *সহীহুল বুখারী- ৩৩৬৬; সহীহ মুসলিম- ৫২০।*

[১১১] *সহীহুল বুখারী- ৪৪৮৪ ও ১৫৮৩; সহীহ মুসলিম- ১৩৩৩।*